বিড়ালটির আচরণের উন্নতি খুবই অনিয়মিত। খাঁচা থেকে বের হতে কখনও সময় লেগেছে বেশী, কখনও অপেক্ষাকৃত কম। তারপর যখন কায়দাটি নির্ভুলভাবে আয়ত্ত হয়েছে তখন সময়ের হার নিয়মিত হয়েছে। বিভিন্ন বারের পরীক্ষণে বিড়ালের উন্নতি নিয়মিত নয় খাঁচা থেকে বাইরে আসতে বিড়ালটির যে সময় লেগেছে, তা পরিমাপ করে যদি লেখ-চিত্রের (graph) মাধ্যমে প্রকাশ করা যায়, তাহলে আমরা ২৩ নং চিত্রে প্রদর্শিত রেখার মতো রেখা পাবো (চিত্র পরপৃষ্ঠায়)।

খাঁচা থেকে বের হবার কৌশল শেখার ব্যাপারে

পরপৃষ্ঠার লেখ-চিত্রটিতে যে অসমান রেখা রয়েছে তা থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, খাঁচার দরজা খোলার কৌশল শিখতে বিড়ালের ২৪ বার প্রচেষ্টা প্রয়োজন হয়েছিল। প্রথম দিকের প্রচেষ্টাগুলিতে প্রথমে বেশী, পরে কম সময় লেগেছে। এই লেখচিত্র (graph) প্রাণীদের শিক্ষণ-প্রণালীর একটি আদর্শ নমুনা হিসেবে গৃহীত হয়ে থাকে। বিড়ালের এই ধরনের শিক্ষণ-রীতিকে 'প্রচেষ্টা ও ভুল সংশোধনের মাধ্যমে শিক্ষা' (Trial and Error) কিংবা 'প্রচেষ্টা ও সাফল্যের মাধ্যমে শিক্ষা'র (trial and success) সার্থক দৃষ্টান্ত হিসেবে গণ্য করা হয়।

প্রচেষ্টা ও ভুল সংশোধনের মাধ্যমে শিক্ষণ

শিক্ষণ সংক্রান্ত এই ধরনের পরীক্ষণ থেকে থর্নডাইক সিদ্ধান্ত করলেন যে, বিড়ালটি খাঁচা থেকে বের হবার সমস্যাকে ঠিকভাবে অনুধাবন করতে পারেনি, কিংবা বিড়ালের আচরণে অন্তর্দৃষ্টি বা পরিজ্ঞানের (insight) কোন পরিচয় পাওয়া যায়নি। বিড়ালের আচরণ বিচার-বুদ্ধিমূলক আচরণ নয়। থর্নডাইকের মতে প্রাণী যা কিছু শেখে তা 'হয় সাফল্য, নয় ব্যর্থতা' ধরনের আচরণের দ্বারাই শেখে। বিড়ালটি যদি প্রকৃতই পরিজ্ঞানের সাহায্যে শিখতো, তাহলে প্রথমবার খাঁচা থেকে বের হবার পর দ্বিতীয়বার আর প্রথমবারের মত অত ভুল আচরণ করতো না। বিড়ালের আচরণের 'লেখ-চিত্র' লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, শিক্ষণ-রেখাটির হঠাৎ নিম্নগতি হয়নি। এর দ্বারা বোঝা যাচ্ছে যে, ভুল আচরণগুলি ধীরে ধীরে বর্জিত হয়েছে। বিড়ালটির শিক্ষণ আকস্মিক (chance or random) এবং সম্পূর্ণভাবে যান্ত্রিক (mechanical)। এখানে কোন পূর্ব-পরিকল্পনা করে সমস্যার সমাধান করা হয়নি। কিংবা সমস্যাটির সামগ্রিক রূপও বিড়ালের কাছে ধরা পড়েনি। শিক্ষণের সাহায্যে সম্পূর্ণ নতুন একটি প্রতিক্রিয়া আয়ত্ত হয়ে থাকে, এমন কথাও বলা যায় না। থর্নডাইকের মতে **শিক্ষণ হল উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যে উপযুক্ত সংযোগসূত্র স্থাপন করা। এই সংযোগসূত্র অন্ধ প্রচেষ্টা ও ভুল সংশোধনের মতো একটি যান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিষ্পন্ন হয়।**[১] শিক্ষণ কোন 'হঠাৎ আলোর ঝলকানি' নয়। শিক্ষণ হঠাৎ নিষ্পন্ন হয় না। শিক্ষণ একটি ধীরগতি প্রক্রিয়া যার ফলে অসফল আচরণ বা

শিক্ষণে পরিজ্ঞানের পরিচয় নেই

শিক্ষণ সম্পূর্ণভাবে যান্ত্রিক

অনুকরণের সাহায্যে শিক্ষণ নিষ্পন্ন হয় না

[১] "Learning is the establishment of bonds between stimulus and response and it follows a mechanical process of blind trial and error."—*Thorndike.*

প্রচেষ্টাগুলি অবলুপ্ত হয় (stamped out) এবং সফল প্রচেষ্টাটি দৃঢ় হয়। এ ছাড়াও, প্রাণী অপরের অনুকরণ করে শেখে, একথা থর্নডাইক স্বীকার করেন না। তিনি স্পষ্টই বলেছেন যে, প্রাণীদের নিয়ে পরীক্ষণের সময় তাঁর অভিজ্ঞতায় এমন কিছুই তিনি পাননি, যার ফলে এমন ধারণা হতে পারে যে, প্রাণীরা অপরের আচরণ অনুকরণ করে কিছু শেখে। হাতে-কলমে কাজের মাধ্যমেই শুধু প্রাণীরা শেখে।

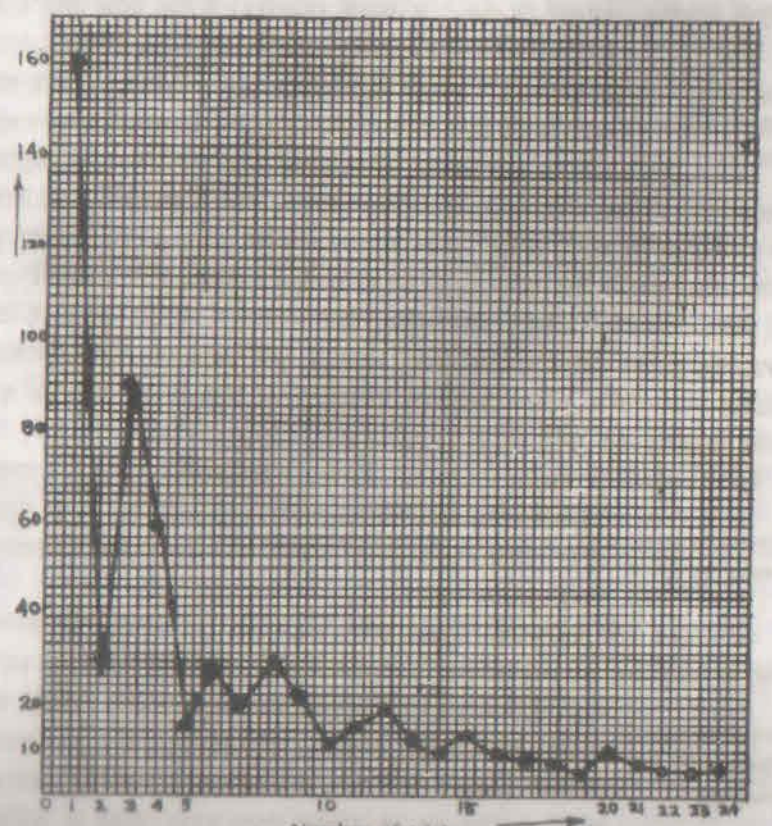

২৩ নং চিত্র

সমালোচনা : থর্নডাইক বলেছেন, প্রাণী কেবল প্রচেষ্টা ও ভুল সংশোধন প্রণালীতে শেখে। এই শিক্ষণের মধ্যে কোন বিচারবুদ্ধি নেই। থর্নডাইকের এই অভিমত অনেকেই গ্রহণ করেন না। এঁদের মতে প্রাণী বিভিন্ন পরিস্থিতির পার্থক্য বুঝতে পারে। সমগ্র পরিস্থিতির

॥ ২ ॥ শিক্ষণ সম্পর্কে বিভিন্ন মতবাদ (Different theories of learning) ঃ

যে সব মনোবিদ্ শিক্ষণ প্রসঙ্গে আলোচনা করেছেন, তাঁরা সকলেই মনুষ্যেতর প্রাণী নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। এইসব পরীক্ষণলব্ধ উপাত্ত থেকে তাঁরা শিক্ষণ সম্পর্কে মতবাদ প্রতিষ্ঠা করেছেন। মনুষ্যেতর প্রাণী নিয়ে পরীক্ষণ করে মতবাদগুলি প্রতিষ্ঠিত হলেও, মানুষের শিক্ষার ক্ষেত্রেও মতবাদগুলি সমভাবে প্রযোজ্য, একথাও ঘোষণা করা হয়েছে। শিক্ষণ সম্পর্কে বিভিন্ন মতবাদের মধ্যে তিনটি মতবাদ প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। মতবাদগুলি হল—(১) প্রচেষ্টা ও ভুল সংশোধন মতবাদ (Trial and Error Theory of Learning) ; (২) সাপেক্ষ প্রতিবর্তক্রিয়াবাদ (Conditioned Reflex Theory of Learning) এবং (৩) পরিজ্ঞানবাদ (Insight Theory of Learning)। পরিজ্ঞানবাদকে শিক্ষণ সম্পর্কে গেস্টাল্ট মতবাদও বলা হয়ে থাকে। এবার এসব মতবাদের আলোচনা করা হচ্ছে।

॥ ৩ ॥ থর্নডাইক-প্রবর্তিত 'প্রচেষ্টা ও ভুল সংশোধন' মতবাদ অথবা যোগসূত্র-স্থাপন মতবাদ বা সংযোজনবাদ (Thorndike's Trial and Error Theory of Learning or Theory of Connectionism or Bond Theory of Learning) ঃ

উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত মনোবিদ্গণের মধ্যে মানুষের শিক্ষাপদ্ধতির মানদণ্ডে মনুষ্যেতর প্রাণীর শিক্ষণ ও অন্যান্য আচরণ ব্যাখ্যা করার একটি ঝোঁক ছিল। মনে করা হত, মনুষ্যেতর প্রাণীরও মানুষের মতো চিন্তা করার ও আবেগ অনুভব করার ক্ষমতা আছে। পার্থক্য শুধু এই যে, এসব প্রাণী এসব ক্ষমতাকে মানুষের মতো প্রকাশ করতে পারে না। প্রাণীমনোবিদ্ লয়েড মরগ্যান (Lloyd Morgan) সর্বপ্রথম এরূপ প্রবণতার বিরুদ্ধে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেন এবং তাঁর সূত্রে এরূপ নির্দেশ দেন যে, "কোন কার্যকে যদি নিম্নতর কোন মানসিক প্রক্রিয়ার ফল হিসেবে ব্যাখ্যা করা সম্ভব হয়, তবে তাকে কোন উচ্চতর মানসিক প্রক্রিয়ার ফল হিসেবে ব্যাখ্যা করা কখনই উচিত নয়।"[৭]

লয়েড মরগ্যানের সূত্র

এই সূত্রকে অবলম্বন করে যিনি সর্বপ্রথম বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে মনুষ্যেতর প্রাণীর শিক্ষণ নিয়ে পরীক্ষণ করেছেন তাঁর নাম ই. এল. থর্নডাইক (E. L. Thorndike)। থর্নডাইক যে সমস্ত পরীক্ষণ করেন, মানুষের শিক্ষণ-প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে তাদের গুরুত্বপূর্ণ অর্থ রয়েছে। অর্থাৎ যদিও তিনি

থর্নডাইক মরগ্যানের সূত্র অনুসরণ করেছেন

[৭] "In no case may we interpret an action as the outcome of the exercise of a higher psychical faculty, if it can be interpreted as the outcome of the exercise of one which stands lower in the psychological scale."—Lloyd Morgan : An Introduction to Comparative Psychology.

মনুষ্যেতর প্রাণীর শিক্ষণ-প্রণালী পরীক্ষণ করেছেন, তবুও এসব পরীক্ষণলব্ধ সিদ্ধান্ত মানুষের শিক্ষণ-প্রণালী সম্পর্কেও প্রযোজ্য। মনুষ্যেতর প্রাণী নিয়ে থর্নডাইক যেসব গবেষণা করেছেন, তা থেকে কতকগুলি সূত্র লাভ করা গেছে। শিশু এবং বয়স্ক ব্যক্তি কিভাবে নতুন অনুষঙ্গ স্থাপন করে ও নতুন জিনিস শিক্ষা করে তা এসব সূত্রের সাহায্যে সুন্দরভাবে বুঝে নেওয়া যায়।

মানুষের আচরণে জটিলতা বেশী এবং মানুষের আচরণ থেকে শিক্ষণের স্বরূপ খুঁজে পাওয়া দুঃসাধ্য বিবেচনা করে থর্নডাইক মনুষ্যেতর প্রাণী, যথা—মাছ, মুরগী, বিড়াল, কুকুর ও বানর নিয়ে বিভিন্ন পরীক্ষা করেন। তবে বিড়াল নিয়ে তাঁর পরীক্ষাই বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেছে।

থর্নডাইক মনুষ্যেতর প্রাণী নিয়ে পরীক্ষণ করেন

বিড়াল নিয়ে পরীক্ষণের সময় থর্নডাইক এক বিশেষ ধরনের খাঁচা বা ধাঁধার বাক্স (cage or puzzle box) ব্যবহার করেন। খাঁচার ভিতরে একটি ক্ষুধার্ত বিড়ালকে রাখা হয় এবং খাঁচার বাইরে বিড়ালের প্রিয় খাদ্য মাছ এমন জায়গায় রাখা হয়, যাতে খাঁচার ভিতর থেকে বিড়াল তা সর্বক্ষণ দেখতে পায়। এর ফলে বিড়াল খাঁচা থেকে বের হবার তাড়না বোধ করে। খাঁচাটির দরজায় একটি সহজ ছিটকিনি, কিংবা তারের ফাঁস, কিংবা একটি লিভার (lever) লাগানো থাকে। ছিটকিনি কিংবা তারের ফাঁসটি টানলে, অথবা লিভারটিতে একটু চাপ দিলেই দরজা খুলে যাবে। দেখা গেল যে, বিড়াল খাঁচার ভিতর থেকে বের হয়ে আসার জন্য ছুটাছুটি, দাপাদাপি, খাঁচার শিক কামড়ে ধরা ইত্যাদি এলোপাতাড়ি চেষ্টা করছে। এইভাবে 'হয় সাফল্য, নয় ব্যর্থতা' (hit-or-miss) ধরনের এলোপাতাড়ি ও অন্ধ চেষ্টা করতে করতে নেহাৎ আকস্মিকভাবে ছিটকিনিতে কিংবা তারের ফাঁসে অথবা লিভারের উপর আঁচড় লাগায় দরজাটি খুলে গেল। এর ফলে বিড়ালটি খাঁচা থেকে বাইরে এসে মাছ খেতে পেল। অল্প একটু মাছ খেতে না খেতেই আবার বিড়ালটিকে খাঁচার ভিতর রেখে দরজা বন্ধ করে দেওয়া হল। এবারও বিড়াল পূর্বের মতই এলোপাতাড়ি ছুটাছুটি করতে শুরু করলো। এইভাবে পরীক্ষণ-পর্বের পুনরাবৃত্তি করে থর্নডাইক দেখলেন যে, পরীক্ষণের পুনরাবৃত্তির সংখ্যা যত বৃদ্ধি পেতে লাগলো, ততই বিড়ালের এলোপাতাড়ি ছুটাছুটি কমতে লাগলো। এইভাবে কমতে কমতে অবশেষে বিড়ালটি দরজা খোলার কৌশল শিখে ফেললো এবং খাঁচায় বন্দী করা মাত্রই বিড়ালটি দরজা খুলে বাইরে আসতে আর কোন ভুল প্রচেষ্টা করলো না। এই ধরনের পরীক্ষণের ফলে থর্নডাইক সিদ্ধান্ত করলেন যে, (১) নতুন পরিবেশে প্রাণী প্রথমে এলোপাতাড়ি প্রচেষ্টা করে, (২) অসফল প্রচেষ্টাগুলিকে ধীরে ধীরে বর্জন করে এবং (৩) পরিশেষে কৌশলটি শিখে ফেলে।

থর্নডাইকের পরীক্ষণের বর্ণনা

থর্নডাইকের সিদ্ধান্ত

থর্নডাইক আরও লক্ষ্য করলেন যে, খাঁচা থেকে বাইরে আসার কৌশলটি নির্ভুলভাবে আয়ত্ত করতে বিড়ালটির কৃতি অথবা বেশী সংখ্যক পরীক্ষণের প্রয়োজন হয়েছে এবং কৌশলটি আয়ত্ত করতে সময় লেগেছে কমবেশী এক ঘণ্টা। কিন্তু এই প্রচেষ্টার ক্ষেত্রেও

দশম অধ্যায়

শিক্ষণ [Learning]

1) Learning—Its nature. 2) Different theories of learning— Trial and Error theory, Gestalt Theory, Pavlov's Conditioned Response Theory.

॥ ১ ॥ শিক্ষণের স্বরূপ (Nature of Learning) ঃ

প্রত্যেক জীব কতকগুলি সহজ প্রবৃত্তি (instinct) এবং প্রতিবর্তক্রিয়ার (reflex activity) ক্ষমতা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। এইসব জন্মগত সামর্থ্য নিয়ে জীব তার পরিবেশের সাথে সঙ্গতি সাধন করার চেষ্টা করে এবং এসব সামর্থ্য জীবের প্রধান প্রধান জৈবিক চাহিদা পূরণ করতে সাহায্য করে। মানুষের ক্ষেত্রেও কিছু জন্মগত সামর্থ্য আছে। কিন্তু এগুলি মানুষের জীবনযাত্রার পক্ষে পর্যাপ্ত নয়। পরিবেশ সতত-পরিবর্তনশীল। এই পরিবর্তনশীল পরিবেশের সাথে তাল মিলিয়ে চলার জন্য আমাদের জন্মগত আচরণ-ছাঁদেরও উপযুক্ত পরিবর্তন সাধন করতে হয়। নতুন নতুন আচরণ করা অর্থাৎ **নতুন কোন আচরণ-ছাঁদ আয়ত্ত করাই হল শিক্ষণের লক্ষ্য।**

শিক্ষণের লক্ষ্য হল নতুন আচরণ-ছাঁদ আয়ত্ত করা

অতীত অভিজ্ঞতার সাহায্যে লাভবান হবার ক্ষমতা আমাদের অন্যতম প্রধান সম্পদ। কল্‌ভিন (Colvin) বলেছেন, শিক্ষণ হল অতীত অভিজ্ঞতার মাধ্যমে প্রতিক্রিয়া-ছাঁদের উপযুক্ত পরিবর্তন সাধন। বর্ণমালা শেখা, মোটরগাড়ি চালাতে শেখা প্রভৃতি মানুষের শিক্ষণের উদাহরণ। এগুলিকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, শিক্ষণের ফলে অভিজ্ঞতা অর্জন করা হয় এবং এসব অভিজ্ঞতা আবার শিক্ষার্থীর আচরণে পরিবর্তন ঘটায়। সুতরাং, **শিক্ষণের অর্থ হচ্ছে অভিজ্ঞতার সাহায্যে নতুন কোন ধারণা কিংবা নতুন কোন আচরণ আয়ত্ত করা।**

নতুন আচরণ আয়ত্ত করা

ব্যক্তির সাথে তার পরিবেশের সম্বন্ধ খুবই নিবিড়। পরিবেশ ব্যক্তির অভিজ্ঞতা ও সামর্থ্যকে যেমন গড়ে তোলে, ব্যক্তিও তেমন তার নিজের সুবিধা অনুযায়ী পরিবেশকে পরিবর্তিত করার চেষ্টা করে। ব্যক্তি ও তার পরিবেশের মধ্যে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফলে অভিজ্ঞতা ও কর্মতৎপরতার মাধ্যমে ব্যক্তির আচরণে যে পরিবর্তন দেখা যায় তাকে শিক্ষণ বলা হয়ে থাকে। একটি পরিবেশে যে আচরণ উপযুক্ত সেই আচরণ-ছাঁদকে আয়ত্ত করতে পারলেই শিক্ষণ পূর্ণতা লাভ করে। সুতরাং, ব্যক্তির আচরণ-ছাঁদকে উপযুক্তভাবে পরিবর্তিত করা এবং এই পরিবর্তিত আচরণ-ছাঁদকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার প্রক্রিয়াই শিক্ষণ। সংক্ষেপে বলতে গেলে, **শিক্ষণ হল উপযোজন বা সঙ্গতি সাধন।**

শিক্ষণ হল উপযোজন

আমাদের সকল প্রকার শিক্ষণই উদ্দেশ্যমূলক অর্থাৎ লক্ষ্যাভিমুখী (purposive)। কোন না কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধ করার জন্যই আমরা শিখি। বিড়ালকে খাঁচার মধ্যে আবদ্ধ করে রাখলে বিড়াল খাঁচা থেকে বের হয়ে আসার চেষ্টা করে। এই চেষ্টার মূলে খাঁচার বাইরে খাদ্য লাভ, কিংবা মুক্তির ইচ্ছা কাজ করে। জীবের মধ্যে কোন চাহিদার সৃষ্টি হলে তা একটা অস্বস্তির ভাব সৃষ্টি করে। যে লক্ষ্যবস্তুকে পেলে এই অস্বস্তি দূর হবে অর্থাৎ চাহিদাটি মিটবে সেই লক্ষ্যবস্তুকে পাবার জন্য জীব সচেষ্ট হয়। এ কারণে বলা যায় যে, **শিক্ষণ-প্রক্রিয়া সর্বদাই উদ্দেশ্যমূলক অর্থাৎ লক্ষ্যাভিমুখী এবং শিক্ষণ সর্বদাই কোন না কোন চাহিদার পরিতৃপ্তি ঘটায়।**

লক্ষ্যাভিমুখী

শিক্ষণ মানুষের একচেটিয়া সম্পত্তি নয়। জীবমাত্রই শেখে। কীট, পতঙ্গ থেকে শুরু করে কুকুর, বিড়াল, ঘোড়া প্রভৃতি নীচু এবং উঁচু স্তরের সব জীবকেই বেঁচে থাকার জন্য কিছু না কিছু শিখতেই হয়। কিন্তু সব জীবের মধ্যে মানুষই সর্বাপেক্ষা বেশি শেখে। মানবশিশুই জন্মের পর বেশ কিছুকাল একেবারে অসহায় ও পরনির্ভর থাকে এবং পরিবেশকে বুঝতে কিংবা পরিবেশে উপযুক্ত সাড়া দিতে পারে না। মানবশিশুকে দীর্ঘকাল ধরে শিখতে হয়। মানুষের সমস্ত জীবন ধরে এই শেখার কাজ চলতে থাকে। মানুষের স্নায়ুতন্ত্র খুব জটিল। তার প্রতিক্রিয়াও সেজন্য জটিল। মানুষের বেলায় শিক্ষণ-প্রক্রিয়া কেবল উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যে সংযোগ স্থাপন করাই নয়, তার বিভিন্ন সমস্যার সমাধানের জন্য উপযুক্ত পদ্ধতি উদ্ভাবন করার প্রক্রিয়াও বটে। সুতরাং, **শিক্ষণ হল নানাবিধ সমস্যার সমাধানের জন্য নতুন কর্মকৌশল (technique) উদ্ভাবন করা।**

কর্মকৌশল উদ্ভাবন

এসব আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষণ-প্রক্রিয়ার নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি লক্ষ্য করা যায় ঃ

(১) শিক্ষণ হল একটি বিশেষ লক্ষ্যে উপনীত হবার জন্য লক্ষ্য অনুযায়ী আচরণকে উপযুক্তভাবে পরিবর্তিত করা এবং কোন বিশেষ পরিবেশে উপযুক্ত প্রতিক্রিয়া করার মতো আচরণকে স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত করা।

(২) শিক্ষণ হল উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যে নতুন-সংযোগ স্থাপন করা।

(৩) শিক্ষণ হল অতীত অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে নতুন পরিস্থিতিতে সার্থক প্রতিক্রিয়া করে কাম্য ফল লাভ করা।

(৪) শিক্ষণ হল কোন বিশেষ উদ্দীপকের স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়ায় পরিবর্তন ঘটিয়ে নতুন একটি প্রতিক্রিয়া উদ্ভাবন করা।

(৫) শিক্ষণ হল কোন সমস্যা সমাধানের জন্য কর্ম-কৌশল উদ্ভাবন ও আয়ত্ত করা।

এসব বৈশিষ্ট্যগুলিকে একসঙ্গে নিয়ে আমরা শিক্ষণের সংজ্ঞা এভাবে দিতে পারি— **পরিবেশের সাথে আমাদের সম্বন্ধের উন্নতিসাধনের জন্য আমাদের আচরণকে যোজনে পরিবর্তিত করা প্রয়োজন, ঠিক সেইভাবে আচরণে পরিবর্তন সাধন করার প্রক্রিয়ার নাম শিক্ষণ।**

শিক্ষণের সংজ্ঞা

সচেতন সত্তার কাছে অতীব পীড়াদায়ক, তা চেতন মন থেকে নির্বাসিত হয়ে নির্জ্ঞানে অবস্থান করে। এর ফলে মুহূর্তমধ্যে আমরা এসব ঘটনার অভিজ্ঞতা বিস্মৃত হই। আবেগীয় বিপর্যয় এড়াবার জন্যই আমরা এ ধরনের অভিজ্ঞতার কথা ভুলে যেতে চাই। ভুলে যাবার এই ইচ্ছাই বিস্মৃতি ঘটায়। উদারহণস্বরূপ ফ্রয়েড বলেছেন যে, একটি রোগীর রোগ নির্ণয়ে ফ্রয়েড ভুল করেছিলেন এবং সেই রোগীটির নামও তিনি বিস্মৃত হয়েছিলেন। রোগ নির্ণয়ে ভুল করা একটি অত্যন্ত অপ্রীতিকর ও লজ্জাজনক ঘটনা। এই অপ্রীতিকর অভিজ্ঞতার কথা তিনি ভুলে যেতে চেয়েছিলেন বলেই তার সাথে জড়িত রোগীর নামও ভুলে গিয়েছিলেন। অনুরূপ কারণেই দেখা যায় যে, আমরা আমাদের পাওনার কথা বেশ মনে রাখতে পারি কিন্তু আমাদের দেনার কথা প্রায়ই ভুলে যাই।

(৫) ব্যবধান পূরণ (Closure) : গেস্টাল্ট মনোবিদগণের মতে যা সম্পূর্ণ বা সুসংগঠিত নয়, যা অসম্পূর্ণ, তা নিয়ে আমাদের মন কখনই তুষ্ট হয় না। বিবিধ পরীক্ষণের পর দেখা গিয়েছে যে, যে কাজ সম্পূর্ণ হয়ে গিয়েছে তা আমরা সহজেই ভুলে যাই। কিন্তু যে কাজ এখনও সম্পূর্ণ হয়নি, যা এখন সম্পূর্ণ করতে হবে তার সম্পর্কে কদাচিৎ বিস্মৃতি ঘটে। কাজটি অসম্পূর্ণ থাকার দরুন তা সম্পূর্ণ করার জন্য মনের মধ্যে একটা চাড় থাকে। এই 'চাড়'-এর জন্যই উক্ত কাজটি আমাদের মনে থাকে।

(৬) অনুষঙ্গ ও অভিভাবনের অভাব (Lack of association and suggestion) : উপযুক্ত অনুষঙ্গ ও অভিভাবনের অভাবেও বিস্মৃতি ঘটতে পারে। অনুষঙ্গ ও অভিভাবনের উপর অতীত অভিজ্ঞতার পুনরুদ্রেক নির্ভর করে। দুটি অভিজ্ঞতার মধ্যে যদি উপযুক্ত অনুষঙ্গ স্থাপিত না হয়, কিংবা বর্তমান অভিজ্ঞতার যদি উপযুক্ত অভিভাবীয় শক্তি না থাকে, তবে বর্তমান অভিজ্ঞতা অতীতের অভিজ্ঞতাটির পুনরুদ্রেক ঘটাতে ব্যর্থ হতে পারে।

(৭) আবেগজনিত বাধা (Emotional blocking) : আবেগজনিত উত্তেজনায় দেহ-মন প্রবলভাবে আলোড়িত হলে অনেক সময় বিস্মরণ ঘটে। ভয়, উত্তেজনা কিংবা ঘাবড়ে যাওয়ার ফলে স্মরণক্রিয়া বাধাপ্রাপ্ত হতে পারে। যে ব্যক্তি জীবনে প্রথম অভিনয় করতে নেমেছে সে তার ভূমিকা ভাল করে আয়ত্ত করা সত্ত্বেও মঞ্চভীতির (stage fright) জন্য তার পার্ট ভুলে যেতে পারে।

(৮) পরিবেশের পরিবর্তন (Change of environment) : আমরা এক একটা বিশেষ পরিবেশে এক একটা বিষয় সম্বন্ধে শিক্ষালাভ করি। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, পরিবেশের পরিবর্তন হলে আমরা শেখা বিষয়টি ভুলে যাই। যেমন—নিজের ঘরে বসে একটি ছাত্র কোন বিষয় মুখস্থ করে সে সম্পর্কে নির্ভুল উত্তর লিখতে পারছে, কিন্তু সেই ছাত্রটিই ক্লাসে দশজনের সাথে বসে সেই শেখা বিষয়টি সম্পর্কে সহজ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারছে না। এক্ষেত্রে পরিবেশের পরিবর্তনের দরুন শেখা বিষয় সম্পর্কে বিস্মৃতি ঘটেছে।

(৯) দৈহিক অসুস্থতা (Bodily illness) : দেহ যদি অসুস্থ থাকে, মস্তিষ্ক যদি ক্লান্ত থাকে, তাহলে আমরা আমাদের জানা জিনিসও মনে করতে গিয়ে দেখি যে, তা মনে

করতে পারছি না। দীর্ঘকাল ধরে কোন মাদক দ্রব্য পান করলে মস্তিষ্ক দুর্বল হয়ে বিস্মৃতি ঘটিয়ে থাকে।

(১০) বাচনিক অনুষঙ্গের অভাব (Want of verbal association) : মনোবিদ ওয়াট্‌সন (Watson)-এর মতে বাচনিক অনুষঙ্গের অভাব অথবা উপযুক্ত ভাষার অভাব বিস্মৃতি ঘটায়। শিশুকালের প্রথম দিকের ঘটনাগুলি যে আমরা স্মরণ করতে পারি না, তার কারণ হল শিশুকালে শিশুর ভাষার অভাব থাকে।

অবশ্য মনে রাখতে হবে যে, বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন কারণের জন্য বিস্মরণ ঘটতে পারে।

॥ ১৯ ॥ স্মৃতির বিপর্যয় (Disorders of Memory) :

যখন কোন বিষয়ের অভিজ্ঞতা মনে ধরে রাখার ক্ষমতায়, তা পুনরুদ্রেক করার ক্ষমতায় এবং ঐ অভিজ্ঞতার স্থান-কাল নির্দেশপূর্বক প্রত্যভিজ্ঞার (অর্থাৎ পুনরুজ্জীবিত অভিজ্ঞতা যে স্মরণকর্তার অতীত অভিজ্ঞতার প্রতিরূপ) ক্ষমতায় বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়, তখনই স্মৃতির বিপর্যয় উদয় হয়।

সাধারণতঃ মস্তিষ্কে (brain) আঘাতজনিত কারণে অভিজ্ঞতা স্মৃতিতে ধারণ করার ক্ষমতায় অবনতি দেখা দেয়। পূর্বঅভিজ্ঞতা পুনরুদ্রেকে অসফলতা মানসিক আঘাতজনিত কারণে হয়ে থাকে ; যেমন হিস্টিরিয়া (hysteria) রোগে। প্রত্যভিজ্ঞায় (recognition) অসমর্থতা মানসিক রোগীদের মধ্যে প্রায়ই দেখা যায়। এরূপ অবস্থায় পরিচিত লোককে চিনতে পারে না, বহু পূর্বের অভিজ্ঞতাকে অল্প কয়েকদিন আগের এবং অল্প আগের অভিজ্ঞতাকে অতি পুরাতন অভিজ্ঞতা বলে মনে হয়।

কোন অভিজ্ঞতা বা ঘটনা মনে করতে না পারাকে সাধারণভাবে অস্মার বা এ্যমনেসিয়া (amneisa) বলে। এরূপ ভুলে যাওয়া ক্ষণস্থায়ী হতে পারে, মাঝে মাঝে ঘটতে পারে, ক্রমবর্ধক (progressive) হতে পারে এবং জন্মগত হতে পারে। প্রথম দুটি সাধারণত মানসিক কারণে হয়ে থাকে। এরূপ অবস্থায় একই ব্যক্তি তার একসময়ের অভিজ্ঞতা অন্য সময়ে মনে করতে পারে না। গল্পের ডাঃ জেকিল এবং মিঃ হাইড (Dr. Jekyll and Mr. Hyde) একই ব্যক্তি হলেও এক অবস্থার অভিজ্ঞতা অন্য অবস্থায় মনে করতে অক্ষম। বহু-ব্যক্তিত্বসম্পন্ন (multiple personality) মানসিক অসুস্থতায় এরূপ হতে পারে।

মনে করার ক্ষমতা অত্যধিক ও অস্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্যও স্মৃতির বিপর্যয় দেখা দিতে পারে। এরূপ অবস্থায় একসঙ্গে বহু জিনিস স্মৃতিতে উদয় হয় এবং বিশৃঙ্খলা ঘটায়। একে বলে অতিস্মারতা (hypermnesia)। এতে বহু পূর্বের অপ্রয়োজনীয় জিনিস এবং ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ব্যাপার মনের মধ্যে ভীড় করে এবং একটা অসহ্যকর অবস্থার সৃষ্টি করে। এগুলিকে তখন সুশৃঙ্খলভাবে নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন হয়ে পড়ে। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে কিছু জিনিস ভুলে যাওয়া আমাদের মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য প্রয়োজন।

সরলীকরণের অঙ্গ প্রসঙ্গে BODMAS (B=Bracket; O=of; D=Division; M=Multiplication; A=Addition; S=Subtraction) কথাটি মনে রেখে যথেষ্ট লাভবান হয়েছিলাম।

এর মূল্য

কিন্তু এখানে মনে রাখা দরকার যে, স্মৃতি-সহায়ক কৌশলগুলির মধ্যে একটা নতুনত্ব ও কৌতুকের উপাদান থাকে বলেই এগুলি কার্যকর হয়। এসব কৌশলের নিজস্ব কোন মূল্য নেই। আবার, প্রথম দিকে এসব কৌশল কার্যকর হলেও শেষ পর্যন্ত এগুলি বরঞ্চ বিরক্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

মন্তব্য : প্রত্যেকেই তার স্মৃতিশক্তিকে উন্নত করতে চায়। কিন্তু পূর্বেই বলা হয়েছে, স্মৃতি-শক্তিকে উন্নত করা সম্ভব নয়। তবে কতকগুলি পদ্ধতিতে পাঠ্যবিষয় শিক্ষা করলে তা সহজেই আয়ত্ত হয় এবং দীর্ঘকাল মনে রাখা যায়। কিভাবে একটি বিষয়বস্তুকে আয়ত্ত করা উচিত তা এখানে সংক্ষেপে পুনরায় বলা হচ্ছে :—(১) কোন বিষয় শিখতে হলে তা শেখার একটা দৃঢ় সংকল্প নিয়ে তা আয়ত্ত করার কাজে লাগতে হবে। (২) শেখার আগ্রহ থাকলে শিক্ষণীয় বিষয়ের প্রতি অধিকতর মনোযোগ দেওয়া সম্ভব হয়। (৩) যে বিষয়টি আয়ত্ত করার চেষ্টা করা হচ্ছে তার একটি যথাযথ প্রতিরূপ (image) গঠন করা একান্ত প্রয়োজন। এমনভাবে প্রতিরূপ গঠন করতে হবে যেন বিষয়টির একটি সুস্পষ্ট ছবি মনের মধ্যে গেঁথে থাকে। (৪) শিক্ষণীয় বিষয়টিকে অন্যান্য বিষয়ের সাথে অনুষঙ্গবদ্ধ করে নেওয়া প্রয়োজন। প্রখর স্মৃতিশক্তির গুপ্ত রহস্যই হল বিষয়বস্তুটির সাথে অন্যান্য বিষয়ের একাধিক অনুষঙ্গ স্থাপন করা। (৫) ছন্দের সাহায্যেও বিষয়বস্তুকে সহজে মনে রাখা যায়। বাল্যকালে সকলেই অঙ্কাধিক সুর করে নামতা মুখস্ত করেছে। (৬) যতক্ষণ মুখস্থ না হয় ততক্ষণ একনাগাড়ে না পড়ে একবার পাঠের পর কিছু সময়ের বিরতি দিয়ে পড়া ভাল। (৭) যেখানেইসম্ভব হবে সেখানেই কয়েকবার পাঠের পর বই বন্ধ করে তা আবৃত্তি করা খুব ভাল। (৮) কোন বিষয় আয়ত্ত করার পর বেশ কিছুটা সময় বিশ্রাম নেওয়া অথবা নিদ্রা যাওয়া খুবই প্রয়োজন। এই সময়ের মধ্যে অধীত বিষয়টি মনের মধ্যে দৃঢ়ভাবে সংরক্ষিত হওয়ার সুযোগ পায়।

॥ ১৮ ॥ বিস্মরণ ও এর কারণ (Forgetfulness and its causes) :

আমরা অনেক বিষয় যেমন শিখি, তেমনই আবার অনেক শেখা জিনিস ভুলেও যাই। বিস্মরণ বা ভুলে যাওয়া একটি সর্বজনীন মানসিক ঘটনা। পূর্বে শিক্ষা করা হয়েছে এমন

বিস্মরণ কাকে বলে

কোন জিনিস মনে করার ক্ষমতার স্থায়ী বা সাময়িক অভাবকেই বিস্মরণ বলা হয়। অর্থাৎ কোন জিনিস আমরা চিরতরে ভুলে যেতে পারি কিংবা সাময়িক ভুলে যেতে পারি। বিস্মৃতিকে আমরা সাধারণতঃ একটি ত্রুটি বা মন্দ জিনিস বলে মনে করি। কিন্তু বিস্মৃতি নিরঙ্কুশ মন্দ জিনিস নয়। বিস্মৃতি সর্বক্ষেত্রেই নিন্দার্হ নয়। কোন কোন ক্ষেত্রে বিস্মৃতি আশীর্বাদস্বরূপ। রিবো (Ribot) বলেছেন, স্মৃতির জন্যই বিস্মৃতির প্রয়োজন আছে। এটি একটি স্ববিরোধী উক্তির মত শোনালেও এর একটি তাৎপর্য আছে। নতুন নতুন অভিজ্ঞতাকে স্মৃতিপটে ধরে রাখার জন্য অনাবশ্যক ও অপ্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতাসমূহকে ভুলে যাওয়া একান্ত প্রয়োজন। নতুবা অপ্রয়োজনীয় স্মৃতিভারে আমাদের মন এমন ভারাক্রান্ত হয়ে পড়বে যে, আর কোন নতুন

অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের অবকাশ থাকবে না। সুতরাং, মনকে অপ্রয়োজনীয় বিষয় থেকে মুক্ত করা দরকার। এছাড়াও, অপ্রীতিকর অভিজ্ঞতা—যেমন শোক,

বিস্মরণ সর্বদাই নিন্দনীয় নয়

মনোমালিন্য ইত্যাদি—যত তাড়াতাড়ি বিস্মৃত হওয়া যায়, ততই মনের পক্ষে মঙ্গল। কিন্তু অনেক সময় আমরা প্রয়োজনীয় বিষয়ও বিস্মৃত হই। যা আমরা প্রয়োজনবোধে শিক্ষা করেছি তাও অনেক সময় ভুলে যাই। এর কারণ কি?

বিস্মৃতির কারণ : প্রত্যক্ষের বিষয়বস্তুর মধ্যে যে সব গুণ থাকার জন্য তার প্রতিরূপ মনের মধ্যে দৃঢ়ভাবে সংরক্ষিত হয়ে থাকে, সেসব গুণের অভাবই হল বিস্মৃতির অব্যবহিত পূর্ববর্তী কারণ। বিষয়বস্তুটি যদি সুস্পষ্ট এবং তীব্র না হয়, কিংবা সেটির যদি পুনরাবৃত্তি না হয় অথবা তা যদি সাম্প্রতিককালের না হয় কিংবা উক্ত বিষয়ের প্রতি আগ্রহের অভাববশতঃ মনোযোগ না দেওয়া হয়, তাহলে উক্ত বিষয় মনের মধ্যে সংরক্ষিত হবে না। এর ফলে তা আমরা ভুলে যাব। সংক্ষেপে, বিষয়বস্তুটি সংরক্ষিত হয়নি বলে তার সম্পর্কে বিস্মরণ ঘটেছে। উদ্দীপকের এবংবিধ ত্রুটি ছাড়াও অন্যান্য কারণেও বিস্মৃতি ঘটতে পারে, যেমন—

(১) পর্যালোচনার অভাব (Lack of review) : কোন বিষয়বস্তু আয়ত্ত করার পর যদি তা নিয়ে আর কোন আলোচনা না করা হয়, তবে সেই বিষয়বস্তু আমরা বিস্মৃত হই। পর্যালোচনা না করলে বিষয়বস্তুটির সংযোগসূত্র ক্ষীণ হতে থাকে এবং কালক্রমে তার কোন চিহ্নই আর থাকে না। মনোবিদ এবিংহস্ (Ebbinghaus) দেখিয়েছেন যে, কোন কিছু শেখার পরই যদি তা পর্যালোচনা না করা হয়, তাহলে শেখার প্রথম আধ ঘণ্টার মধ্যেই আমরা উক্ত বিষয়ের প্রায় অর্ধেক অংশ ভুলে যাই।

(২) পশ্চাৎমুখী বাধ (Retroactive inhibition) : কোন বিষয় শেখার অব্যবহিত পরেই অপর একটি ভিন্ন বিষয় শিখতে গেলে দ্বিতীয় বিষয়টির শিক্ষণ প্রথম বিষয়টির সংরক্ষণকে বাধা দেয়। একেই 'পশ্চাৎমুখী বাধ' বলে। দুটি বিভিন্ন বিষয় শিক্ষা করার মধ্যে যদি সময়ের দিক থেকে বেশ কিছুটা ব্যবধান না রাখা হয়, তবে দেখা যাবে যে দ্বিতীয় বিষয়টি প্রথম বিষয়টির স্মরণ-ক্রিয়ার বিঘ্ন সৃষ্টি করছে, অর্থাৎ প্রথম বিষয়টির কিছু কিছু অংশ সম্পর্কে বিস্মৃতি ঘটাচ্ছে।

(৩) আঘাত (Shock) : অনেক সময় দেখা যায় মস্তিষ্কে কোন আঘাতের দরুন বিস্মৃতি ঘটে। যুদ্ধের সময় দেখা গিয়েছে, বোমার বিস্ফোরণের শব্দে মস্তিষ্কে আঘাত পেয়ে অনেক সৈনিক তাদের নাম-ধাম ইত্যাদি ভুলে গিয়েছে। এ ধরনের ঘটনাকে 'আঘাতজনিত অস্মার' (shock amnesia) অর্থাৎ আঘাতের দরুন আকস্মিক স্মৃতি বিলোপ বলা হয়।

(৪) অবদমন (Repression) : ফ্রয়েড (Freud) অবদমনকেই বিস্মৃতির কারণ হিসেবে নির্দেশ করেছেন। নিজের অপরাধ কিংবা লজ্জাজনক কোন ঘটনার অভিজ্ঞতা, যা আমাদের

অন্তর্ভুক্ত। আবার, সাদা এবং কালো উভয়েই রঙ, অর্থাৎ একই শ্রেণীর অন্তর্গত বলে এদের মধ্যে জাতিগত সাদৃশ্য (generic) বর্তমান। দুটি বিপরীত জিনিসের মধ্যে জাতিগত সাদৃশ্য থাকে বলেই তাদের একটি অপরটিকে অভিভাবিত করে। এজন্যই সাদা বললে কালোর কথা মনে পড়ে, সুখের কথা মনে পড়ে না। আবার, সুখ বললে দুঃখের কথা মনে পড়ে, যেহেতু উভয়েই অনুভূতি শ্রেণীর অন্তর্গত। কাজেই বৈপরীত্য সম্বন্ধীয় নিয়ম আংশিকভাবে সাদৃশ্যমূলক। এজন্যই বৈপরীত্য-সম্বন্ধীয় নিয়ম কোন নিয়ম নয়।

নৈকট্য-সম্বন্ধীয় নিয়ম এবং সাদৃশ্য-সম্বন্ধীয় নিয়মের মধ্যেও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। এরা পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। এজন্যই মনোবিদগণ অনুষঙ্গের তিনটি নিয়মের পরিবর্তে যে কোন একটিকে মূল নিয়ম বলা যায় কিনা তা অনুসন্ধান করেছেন।

স্পেন্সার (Spencer) প্রমুখ মনোবিদগণের মতে যেহেতু নৈকট্য-সম্বন্ধীয় নিয়ম সাদৃশ্যের ভিত্তি ছাড়া কখনই কার্যকরী হয় না, সেহেতু সাদৃশ্য-অনুষঙ্গ নিয়মই মূল নিয়ম। ধরা যাক—আমার বন্ধুর নাম শুনে তার চেহারা মনে পড়ে গেল। এ ঘটনাকে সাধারণতঃ আমরা নৈকট্য-সম্বন্ধীয় নিয়মের সাহায্যে ব্যাখ্যা করি। কিন্তু এখানে স্মরণ প্রক্রিয়াটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, বর্তমানে বন্ধুর নাম শুনলাম এবং বর্তমানে শোনা এই নামটি পূর্বে শোনা নামটি মনে করিয়ে দিচ্ছে, যেহেতু উভয় নামের মধ্যে সাদৃশ্য আছে। এখানে যে নামটি মনে পড়লো তার সাথে বন্ধুর চেহারা নৈকট্য-সম্বন্ধে অনুষঙ্গবদ্ধ হয়ে আছে। এর ফলে বন্ধুর চেহারা মনে পড়েছে। সুতরাং, যাকে আমরা নৈকট্য-অনুষঙ্গের দরুন স্মরণক্রিয়া বলি, তার মধ্যে সাদৃশ্য-অনুষঙ্গ নিয়মের প্রভাব রয়েছে। কিন্তু এক্ষেত্রে সাদৃশ্য-অনুষঙ্গের ফলে পুনরুজ্জীবিত অংশটুকু সুস্পষ্ট নয় বলে নৈকট্য-অনুষঙ্গের অভিভাবনই প্রধান হিসাবে আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হয়।

অপরপক্ষে জেমস্ (James) প্রমুখ মনোবিদগণের মতে নৈকট্য-সম্বন্ধীয় নিয়ম অনুষঙ্গের মূল নিয়ম, যেহেতু সাদৃশ্যের দরুন যা স্মরণ করা হচ্ছে বলে মনে হয়, তার মধ্যেও নৈকট্য-সম্বন্ধ প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করে। সাদৃশ্য বলতে আংশিক অভিন্নতা ও আংশিক ভিন্নতা বোঝায়। অভিন্ন অংশটুকু সাদৃশ্য-অনুষঙ্গের দ্বারা এবং যে অংশে উভয়ের ভিন্নতা তা নৈকট্য-অনুষঙ্গের দ্বারা অভিভাবিত হয়। 'নরেশ' নামটি শুনে 'নরেন' নামটি মনে পড়ে গেলে আমরা বলে থাকি যে, সাদৃশ্যের জন্যই তা মনে পড়েছে। কিন্তু এক্ষেত্রে স্মরণক্রিয়াটির বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে 'নরেশ' নামটির 'নরে' অংশটুকু সাদৃশ্যবশতঃ 'নরেন' নামটির 'নরে' অংশটুকুকে মনে করিয়ে দেয়। এই দ্বিতীয় 'নরে' অংশের সাথে 'ন' অংশটি নৈকট্য-সম্বন্ধে যুক্ত থাকায় 'নরেন' নামটি মনে পড়ে গিয়েছে। এখানে নাম দুটির মধ্যে যে অংশটুকু ভিন্নতাসূচক সেই অংশটুকুর অর্থাৎ আলোচ্য উদাহরণে 'ন' অংশটুকুর স্মরণ হওয়াই বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ এবং তা হয়েছে নৈকট্য-অনুষঙ্গের ফলে। অতএব, জেম্‌সের মতে নৈকট্য-সম্বন্ধীয় অনুষঙ্গের নিয়মটিই মূল নিয়ম।

জেমসের মতে নৈকট্য-অনুষঙ্গই মূল নিয়ম

এতক্ষণ যা আলোচনা করা হল তা থেকে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে, অনুষঙ্গের কোন একটি নিয়মকে মূল নিয়ম হিসাবে গ্রহণ করা যায় না। কেননা, অনুষঙ্গের কোন্ নিয়মটি প্রধান ও মৌলিক তা নির্ণয় করতে গিয়ে কেউ সাদৃশ্য-অনুষঙ্গকে নৈকট্য-অনুষঙ্গের উপর নির্ভরশীল, কেউ বা আবার নৈকট্য-অনুষঙ্গকে সাদৃশ্য-অনুষঙ্গের উপর নির্ভরশীল বলে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু এর ফলে একটিকে অপরটি অপেক্ষা বেশি গুরুত্বপূর্ণ ও মৌলিক বলে গণ্য করা ভুল। অনুষঙ্গনীতি একটি ব্যাপকতর নিয়ম। নৈকট্য, সাদৃশ্য ও বৈপরীত্য এরা এই ব্যাপক নিয়মের তিনটি দিকমাত্র। মনোবিদ হামিল্টন (Hamilton) এইজন্য অনুষঙ্গের তিনটি নিয়মকে একটি ব্যাপকতর মূল নিয়মের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। তিনি এই ব্যাপকতর নিয়মকে 'পুনঃসমাকলন নিয়ম' (Law of Redintegration) বলে অভিহিত করেছেন। পুনঃসমাকলন নিয়মের মূল কথা হল আমাদের অভিজ্ঞতার একটি সামগ্রিক রূপ আছে। বিভিন্ন অভিজ্ঞতার মধ্যে সাদৃশ্য অথবা নৈকট্য সম্বন্ধে আবিষ্কার করে আমাদের মন ওইসব বিচ্ছিন্ন অভিজ্ঞতাকে একটি সামগ্রিক রূপ দান করে মনের মধ্যে ধরে রাখে। পরবর্তী সময়ে এই সমগ্রতার কোন একটি অংশ সম্পর্কে অভিজ্ঞতা হলে তা অতীতের সামগ্রিক অভিজ্ঞতাকেই স্মরণ পথে এনে দেয়।[৮] মনোবিদ স্টাউট (Stout)-এর মতে আমরা কতকগুলি ঘটনার প্রতি একই সঙ্গে মনোযোগ দিই বলে ওই সব বিভিন্ন ঘটনার অভিজ্ঞতা আমাদের মনের মধ্যে সুবিন্যস্ত হয়ে একটি সামগ্রিক রূপ লাভ করে।

হ্যামিলটনের পুনঃসমাকলন নিয়মই মূল অনুষঙ্গনীতি এবং সাদৃশ্য ও নৈকট্য-অনুষঙ্গ এরই দুটি দিক মাত্র

কাজেই দেখা যাচ্ছে যে সমগ্রের একটি অংশের অভিজ্ঞতা হলেই আমাদের সমগ্র বিষয়টি মনে করার দিকে একটা প্রবণতা দেখা দেয়। তাই ঐ অংশটি সহজেই সমগ্র বিষয়টি মনে করিয়ে দেয়। বজ্র এবং বিদ্যুৎ, উভয় মিলে একটি সামগ্রিক ঘটনা। এই দুটিই একটি সামগ্রিক অভিজ্ঞতার অংশ। তাই বিদ্যুৎ দেখলেই সমগ্র অভিজ্ঞতাটিই মনে পড়ে।

শারীরবৃত্তের (Physiology) দিক থেকে বিচার করলে দেখা যায় যে যে-কোন অভিজ্ঞতার ফলে আমাদের নার্ভতন্ত্র সামগ্রিকভাবে উদ্দীপিত হয়। কাজেই কোন একটি ঘটনার একটি অংশের অভিজ্ঞতা যখন হয় তখন সমগ্র অভিজ্ঞতাটির সঙ্গে যে নার্ভতন্ত্রের উদ্দীপনা যুক্ত ছিল তা পুরোপুরি উদ্দীপিত হয় বলে সমগ্র অভিজ্ঞতাটি আমাদের মনে পড়ে।

মন্তব্য ঃ প্রাচীনপন্থী মনোবিদগণ অনুষঙ্গবাদের (associationism) উপর খুব গুরুত্ব আরোপ করতেন। আধুনিক মনোবিদগণ এর বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদ করেছেন। আধুনিক মনোবিদগণ আত্মসের অভিজ্ঞতাসমূহকে পরস্পর বিচ্ছিন্ন পরমাণু হিসাবে গ্রহণ করার বিপক্ষে। তাঁদের মতে বাহ্য পরিবেশের সাথে মনের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফলে বিভিন্ন অভিজ্ঞতার সৃষ্টি হয়। দুটি বিষয় আমাদের অভিজ্ঞতায় কয়েকবার একসঙ্গে উপস্থিত হলেই তাদের মধ্যে অনুষঙ্গ স্থাপিত হয় না। বিষয়গুলির নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের জন্যই তারা আমাদের অভিজ্ঞতায়

---

৮. হফ্‌ডিং (Hoffding) একে Law of Totality আখ্যা দিয়েছেন। কেউ কেউ একে Whole-ing-ও বলেছেন।

প্রতিরূপের মধ্যে অনুষঙ্গকেই অনুষঙ্গ বলে

প্রত্যক্ষরূপের মধ্যেকার অনুষঙ্গ নয়। দুটি প্রত্যক্ষরূপের সম্বন্ধ অনুযায়ী মনের মধ্যে তাদের প্রতিরূপের মধ্যে যে সম্বন্ধ স্থাপিত হয়, সেই সম্বন্ধকেই মনোবিদ্যায় অনুষঙ্গ বলা হয়।

(খ) সাদৃশ্য সম্বন্ধীয় নিয়ম (Law of Similarity) : আমাদের অভিজ্ঞতায় দুই বা ততোধিক বিষয়ের মধ্যে সাদৃশ্য থাকলে, সেই সব বিষয়বস্তুর প্রতিরূপও সাদৃশ্যের জন্য অনুষঙ্গবদ্ধ হয়ে যায় এবং তাদের মধ্যে একটি অপরটির কথা মনে করিয়ে দেয়। যেমন—অনুপস্থিত বন্ধুর ফটো দেখে তার কথা মনে পড়ে, যেহেতু ফটোর প্রতিকৃতির সাথে বন্ধুর চেহারার মিল আছে। নরেশের কথায় নরেনের কথা এসে যেতে পারে, যেহেতু নাম দুটির মধ্যে সাদৃশ্য আছে। কবিরা যে-সব রূপক অলংকার ব্যবহার করেন তার মূলেও সাদৃশ্য সম্বন্ধীয় নিয়মই কাজ করে। তাই, কোন সুন্দরী রমণীর কমনীয় চলনভঙ্গী দেখে ভারতীয় কবির মনে মরালের গমন ভঙ্গীর ছবি ফুটে ওঠে কিংবা চাঁদ দেখে কারও মুখের কথা মনে পড়ে।

সাদৃশ্য-অনুষঙ্গের ব্যাখ্যা

সাদৃশ্য প্রসঙ্গে একটি কথা মনে রাখা দরকার। দুটি বিষয় যদি সব দিক থেকে অবিকল অভিন্ন হয়, তাহলে একটির পক্ষে অপরটিকে অভিভাবিত করা অসম্ভব। দুটি জিনিসের মধ্যে কিছুটা সাদৃশ্য এবং কিছুটা ভিন্নতা থাকতে হবে, তবেই সাদৃশ্য সম্বন্ধীয় নিয়ম তাদের মধ্যে কাজ করতে পারবে।

দুটি অভিন্ন বিষয়ের মধ্যে সাদৃশ্য-অনুষঙ্গ কার্যকর হয় না

(গ) বৈপরীত্য সম্বন্ধীয় নিয়ম (Law of Contrast) : দুটি অভিজ্ঞতা যদি পরস্পর বিপরীত হয়, তা হলেও তাদের মধ্যে অনুষঙ্গ স্থাপিত হতে পারে এবং একটি অপরটির কথা মনে করিয়ে দিতে পারে। যেমন—মানুষ দুঃখে পড়লে বিগত সুখের দিনগুলির কথা তার মনে পড়ে যায়। তেমনই, সাদার কথায় কালোর কথা মনে পড়ে, অমাবস্যার কথায় পূর্ণিমার কথা মনে পড়ে। এসব ক্ষেত্রেই দুটি ধারণা পরস্পর বিপরীত বলেই তারা মনের মধ্যে অনুষঙ্গবদ্ধ হয়েছে এবং একটি অপরটির কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে।

বৈপরীত্য-অনুষঙ্গের ব্যাখ্যা

॥ ১১ ॥ অনুষঙ্গের নিয়মগুলির পারস্পরিক সম্বন্ধ (Relation between the Laws of Associaion) :

অনুষঙ্গের তিনটি নিয়ম পরস্পর থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র নয়। এদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। কোন কোন মনোবিদ আবার অনুষঙ্গের তিনটি নিয়মের সব কটিকেই মূল নিয়ম বলে স্বীকার করেন না।

বৈপরীত্য-অনুষঙ্গের নিয়ম কোন মূল নিয়ম নয়। এটি অংশতঃ নৈকট্য-সম্বন্ধীয় নিয়ম এবং অংশতঃ সাদৃশ্য-সম্বন্ধীয় নিয়মের উপর নির্ভরশীল। বৈপরীত্য সম্বন্ধে-যুক্ত ধারণা দুটিকে আমরা সাধারণতঃ একসঙ্গে চিন্তা করে থাকি। সাদা রঙের স্বরূপ ভালভাবে বুঝে নেবার জন্য একে কালো রঙের সাথে তুলনা করে কোথায় এর পার্থক্য তা বুঝে নিতে হয়। সুতরাং, সুস্পষ্ট অবধারণের জন্য আমরা সাধারণতঃ সাদা ও কালো, এই দুটি ধারণাকে একসঙ্গে চিন্তা করি। কাজেই, বৈপরীত্য সম্বন্ধীয় নিয়ম কিছুটা নৈকট্য-সম্বন্ধীয় নিয়মের

বৈপরীত্য-অনুষঙ্গ অংশত নৈকট্য-অনুষঙ্গের উপর নির্ভরশীল। সেইজন্য তা মূল নিয়ম নয়

(৩) পুনরুদ্রেক বা পুনরুজ্জীবন (Recall or Reproduction) : শেখা বিষয়গুলিকে মনের মধ্যে কেবল সংরক্ষণ করলেই হবে না ওইসব সংরক্ষিত বিষয়ের যথাযথ পুনরুদ্রেকও প্রয়োজন, নতুবা তাকে স্মৃতি বলা চলবে না। মনে রাখাই সব নয়। যা মনে রাখা হয়েছে তাকে যথাযথ ভাবে পুনরুজ্জীবিত করতে পারা স্মৃতির একটি প্রধান অঙ্গ। আসংজ্ঞান স্তরে সংরক্ষিত অতীত অভিজ্ঞতার চিহ্নগুলিকে তাদের রূপ ও পরম্পরার কোন ব্যতিক্রম না করে অবিকল সেইভাবে প্রতিরূপের মাধ্যমে চেতনলোকে তুলে আনার নামই পুনরুদ্রেক বা পুনরুজ্জীবন। কোন উদ্দীপক কিংবা অভিভাবন (suggestion) কিংবা কোন সংকেতের (cue) সাহায্যে অতীত অভিজ্ঞতার পুনরুদ্রেক সম্ভব হয়। সুতরাং, পুনরুদ্রেক হল স্মৃতির তৃতীয় উপাদান বা অঙ্গ। বাস্তবিকপক্ষে সংরক্ষণ ও পুনরুদ্রেক এই দুটিই স্মৃতির উপাদানগুলির মধ্যে প্রধান।

(৪) প্রত্যভিজ্ঞা (Recognition) : পুনরুদ্রেকই স্মৃতির পক্ষে যথেষ্ট নয়। সংরক্ষিত অভিজ্ঞতাকে পুনরুজ্জীবিত করলেই তা পূর্ণাঙ্গ স্মৃতি হবে না। প্রতিরূপের মাধ্যমে যে ঘটনা চেতনলোকে পুনরুজ্জীবিত হয়েছে তা যে স্মরণকর্তারই অতীত অভিজ্ঞতার প্রতিরূপ, এই জ্ঞান থাকতে হবে। অর্থাৎ, পুনরুজ্জীবিত প্রতিরূপকে আমারই অতীত অভিজ্ঞতার প্রতিরূপ বলে চিনে নিতে পারা চাই। একেই বলে 'প্রত্যভিজ্ঞা'। অনেক সময় আমরা কোন বিষয়ের কথা স্মরণ করতে পারি, কিন্তু এটি যে আমারই অতীত অভিজ্ঞতার প্রতিরূপ, সেভাবে চিনে নিতে পারি না। এক্ষেত্রে আমাদের স্মরণক্রিয়া পূর্ণাঙ্গ হল না। প্রত্যভিজ্ঞা হল একটি পরিচিতির বোধ, যা না থাকলে স্মরণক্রিয়াকে সফল স্মরণ বলা যাবে না। সুতরাং, প্রত্যভিজ্ঞা হল স্মৃতির চতুর্থ উপাদান।

(৫) স্থান-কাল নির্দেশ (Localisation) : স্মৃতির অপর একটি উপাদান হিসাবে অনেকে 'স্থান-কাল নির্দেশের' কথা উল্লেখ করেন। বস্তুতঃ, প্রত্যভিজ্ঞার মধ্যেই প্রতিরূপের স্থান-কাল নির্দেশ থাকে। যে বিষয়ের প্রতিরূপ এখন স্মরণপথে এসেছে, তা বাস্তবে কোথায় ও কখন প্রত্যক্ষ করা হয়েছিল, তা বুঝতে না পারলে প্রতিরূপটিকে আমাদের অতীত অভিজ্ঞতার প্রতিরূপ বলে চিনতে পারা যাবে না। "পাখি সব করে রব, রাতি পোহাইল" কবিতাটির কথা যখন মনে পড়ে তখন সেই সঙ্গেই মনে পড়ে কবে এবং কোন্ বইয়ে এই কবিতাটি আমরা পড়েছিলাম। তখনই আমরা একেপূর্বে অধীত কবিতার স্মৃতি বলে চিনে নিতে পারি।

(৬) ব্যক্তিত্বের অভিন্নতা (Personal identity) : স্মৃতি বা স্মরণক্রিয়া আমাদের ব্যক্তিত্বের অভিন্নতাকে আশ্রয় করে সম্ভব হয়। সেজন্য ব্যক্তিত্বের অভিন্নতাকে স্মৃতির একটি উপাদান বা অঙ্গ হিসাবে স্বীকার করা হয়। স্থান-কাল নির্দেশ করতে গেলেই ব্যক্তিত্বের অভিন্নতার বোধ বা ব্যক্তিগত অভিন্নতার বোধ থাকা একান্ত প্রয়োজন। যে আমি শৈশবে কবিতাটি মুখস্থ করেছিলাম সেই আমিই দীর্ঘকাল পরে আজ কবিতাটি স্মরণ করছি—এই ধরনের একটা বোধ থাকতে হবে। যদিও একে অনেকেই স্মৃতির কোন

উপাদান বলে স্বীকার করেন না, তবু এ ধরনের ব্যক্তিত্বের অভিন্নতাবোধ ছাড়া স্মৃতির ব্যাখ্যা সম্ভব নয়।

যদি স্থান-কাল নির্দেশ ও ব্যক্তিত্বের অভিন্নতাকে প্রত্যভিজ্ঞার অন্তর্গত বলে ধরে নেওয়া হয় তাহলে স্মৃতির উপাদান হবে চারটি, যথা—শিক্ষণ, সংরক্ষণ, পুনরুদ্রেক ও প্রত্যভিজ্ঞা। আবার, যেহেতু শিক্ষণকে অনেকে স্মৃতির উপাদান বলে স্বীকার করেন না সেইহেতু একথাও বলা যায় যে, সংরক্ষণ, পুনরুদ্রেক এবং প্রত্যভিজ্ঞা এই তিনটিই স্মৃতির প্রধান উপাদান বা অঙ্গ।

যদিও স্মৃতিকে বিশ্লেষণ করলে এর মধ্যে বিভিন্ন উপাদান দেখতে পাওয়া যায়, তবু স্মৃতি এসব উপাদানের সমষ্টিমাত্র নয়। স্মৃতি হল এসব উপাদানের মিথস্ক্রিয়া অর্থাৎ পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফল। স্মৃতির সংজ্ঞা হিসাবে অতীতের অভিজ্ঞতার পুনরুদ্রেক বললেও স্মৃতি-প্রতিরূপ অতীতের অভিজ্ঞতার হুবহু নকল নয়। স্মৃতি-প্রতিরূপের মধ্যে কমবেশি নতুনত্ব থাকে। আমাদের মনোভাব (attitude) এবং আবেগের দ্বারা রঞ্জিত হয়ে অতীত অভিজ্ঞতাগুলি পুনরুজ্জীবিত হয়। যদি আমরা মনে করি, অতীত অভিজ্ঞতার বিষয়গুলি তাদের যথাযথ রূপে মনের মধ্যে সংরক্ষিত থাকে এবং ঠিক সেইভাবে তারা পুনরুজ্জীবিত হয়, তাহলে ভুল করা হবে। আমাদের স্বভাবের দ্বারা অতীত অভিজ্ঞতাগুলি নতুন করে বিন্যস্ত হয় এবং এর ফলে স্মৃতিতে আমরা যা পাই তা অল্পবিস্তর নতুন একটি অভিজ্ঞতা।[৬]

॥ ৯ ॥ সংরক্ষণের সমস্যা (Problem of Retention) :

স্মৃতির প্রধান সমস্যা হল সংরক্ষণের সমস্যা। অতীত অভিজ্ঞতাগুলি কিভাবে সংরক্ষিত হয় এবং কোথায় সংরক্ষিত হয়? অতীত অভিজ্ঞতা যে সংরক্ষিত হয় তা আমরা আমাদের স্মরণক্রিয়াতেই জানতে পারি। সংরক্ষিত না হলে অভিজ্ঞতাকে বর্তমানে স্মরণ করা যেত না। প্রথম দৃষ্টিতে অতীত অভিজ্ঞতার সংরক্ষণকে সহজ বলে মনে হয়। আমাদের চারিদিকের জগতে যেসব বস্তু দেখি, তারা সকলেই কোন না কোন স্থানে থাকে। আমরা যখন বলি, চেয়ারটি আছে, তখন আমরা একথাই বলতে চাই, চেয়ারটি বৈঠকখানায় আছে। ঠিক সেইভাবে আমরা মনে করি, আমাদের 'মন'ও ঘরের মতো একটি স্থান (space) এবং অতীত অভিজ্ঞতার প্রতিরূপগুলি এই ঘরের মধ্যে থাকে; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে প্রতিরূপগুলি প্রতিরূপ হিসাবে মনের মধ্যে জমা থাকে না। যেমন—বরফ ঠাণ্ডা, কিন্তু বরফের প্রতিরূপটি ঠাণ্ডা নয়। একটি সাত ফুট লম্বা খাটের প্রতিরূপও সাত ফুট লম্বা নয়। কাজেই দেখা

---

৬. "It is certainly fallacious to assume that the previous experience has gone into cold storage in the interval and re-emerged intact. A memory is a new experience determined by the disposition liad down by a previous experience."
—*Ross : Groundwork of Educational Psychology.* P. 184

॥ ৮ ॥ স্মৃতির স্বরূপ ও বিশ্লেষণ অথবা স্মৃতির বিভিন্ন উপাদান (Nature and Analysis of Memory or The Factors of Memory)

আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে আমরা নানা বিষয় প্রত্যক্ষ করি। এদের মধ্যে কিছু কিছু বিষয় মনের মধ্যে কোন দাগ না রেখেই সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। আমরা যা কিছু প্রত্যক্ষ করি তার সবকিছুই মনের উপর সমানভাবে রেখাপাত করে না। প্রত্যক্ষের কতকগুলি বিষয় প্রত্যক্ষরূপের অন্তর্ধানের পর আমাদের মনের মধ্যে রেখাপাত করে কতকগুলি চিহ্ন (trace) রেখে যায়। এসব চিহ্ন মনের আসংজ্ঞান স্তরে (pre-conscious) জমা থাকে এবং ভবিষ্যতে অভিভাবনের (suggestion) ফলে প্রতিরূপ বা মানসছবির আকারে চেতনলোকে পুনরুজ্জীবিত হয়। **অতীত অভিজ্ঞতার যে সব চিহ্ন মনের আসংজ্ঞানে সংরক্ষিত থাকে, তাদের আসল রূপ ও পরম্পরার কোন পরিবর্তন না করে অবিকল সেইরকম একটি প্রতিরূপের মাধ্যমে তাদের পুনরুজ্জীবিত করার ক্ষমতাকে স্মৃতি (Memory) বলে এবং এই প্রক্রিয়াকে বলে স্মরণক্রিয়া (Recalling)।** যেমন—কবিতা মুখস্থ করা এবং যেমনভাবে কবিতাটি ছিল তেমনভাবে তাকে মনে রাখার নাম স্মৃতি, আর পরে কোন সময়ে সেই কবিতাকে যেমনভাবে মুখস্থ করা হয়েছিল তেমনভাবে আবৃত্তি করার নাম স্মরণক্রিয়া। 'স্মৃতি' পদটি সাধারণতঃ দুটি অর্থে ব্যবহৃত হয়। প্রথমতঃ, স্মৃতি বলতে 'সংরক্ষণ' (Retention) অর্থাৎ ধারণ করা এবং দ্বিতীয়তঃ, 'পুনরুজ্জীবন' অর্থাৎ 'পুনরুদ্রেক' (Reproduction অথবা Recall) বোঝায়। যেমন—শিক্ষার্থী তার পাঠ্যবিষয় বার বার পাঠ করে তাকে মনের মধ্যে সংরক্ষণ করে বা ধরে রাখে এবং অধ্যাপক যখন ওই বিষয়ে প্রশ্ন করেন তখন শিক্ষার্থী উত্তর দেবার জন্য সেই সংরক্ষিত বিষয়টির পুনরুদ্রেক করে। প্রশ্ন করা যেতে পারে—স্মৃতি বলতে ঠিক কি বুঝবো? এর উত্তরে মনোবিদ স্টাউট (Stout) বলেছেন, পুনরুদ্রেক বা পুনরুজ্জীবন অর্থেই 'স্মৃতি' কথাটিকে ব্যবহার করা উচিত। অবশ্য পুনরুদ্রেক করতে হলেই পূর্ব-অভিজ্ঞতাকে মনের মধ্যে সংরক্ষণ করতে হবে। স্টাউট বলেছেন, "সময় সময় 'স্মৃতি' কথাটিকে 'ধৃতি' বা 'ধারণ করা' কথাটির সমার্থক মনে করা হয়। স্মৃতি কথাটির এ ধরনের প্রয়োগ অসুবিধাজনক। যথাযথ পুনরুদ্রেক অর্থেই 'স্মৃতি' কথাটির প্রয়োগ সীমাবদ্ধ রাখা ভাল।" সুতরাং **অতীত অভিজ্ঞতাকে অবিকল সেই রকম প্রতিরূপের আকারে পুনরুজ্জীবিত বা পুনরুদ্রিক্ত করাকেই স্মৃতি বা স্মরণক্রিয়া বলে।**

স্মৃতি কাকে বলে

স্মৃতির বিভিন্ন উপাদান বা অঙ্গ ঃ স্মৃতি বলতে যেমন 'মনে রাখা' বোঝায়, তেমনই 'মনে করা' বা 'স্মরণ করা'ও বোঝায়। 'মনে রাখা' বলতে অতীত অভিজ্ঞতার 'সংরক্ষণ' এবং 'মনে করা' বলতে অতীত অভিজ্ঞতার 'পুনরুদ্রেক' বা 'পুনরুজ্জীবন' বোঝায়। কিন্তু সংরক্ষণ ও পুনরুদ্রেক স্মৃতির দুটি প্রধান অঙ্গ বা উপাদান হলেও এ দুটিই একমাত্র উপাদান নয়। স্মৃতিকে বিশ্লেষণ করলে যেসব অঙ্গ বা উপাদান পাওয়া যায় তা হল—(১) অভিজ্ঞতা লাভ ও শিক্ষণ (Acquisition and learning), (২) সংরক্ষণ (Retention), (৩) পুনরুদ্রেক বা পুনরুজ্জীবন (Recall or Reproduction), (৪) প্রত্যভিজ্ঞা (Recognition), (৫) স্থান-কাল নির্দেশ (Localisation) এবং (৬) ব্যক্তিত্বের অভিন্নতা (Personal identity)। এবার এই উপাদানগুলি সম্পর্কে আলোচনা করা হচ্ছে।

(১) অভিজ্ঞতা লাভ ও শিক্ষণ (Acquisition and Learning) ঃ মনোবিদ উড্‌ওয়ার্থ (Woodworth) শিক্ষণকে স্মৃতির প্রথম সোপান বলে বর্ণনা করেছেন। কোন কিছু মনে করতে হলে তা পূর্বে নিশ্চয় কোথাও দেখতে হবে অথবা শুনতে হবে অথবা শিক্ষা করতে হবে। যার সম্পর্কে কোন অভিজ্ঞতাই নেই, যা আদৌ শিক্ষা করা হয়নি, তার সম্পর্কে স্মৃতি সম্ভব নয়। যে ব্যক্তি কখনই শান্তিনিকেতন দেখেনি এবং এর কথাও শোনেনি, তার পক্ষে শান্তিনিকেতনের স্মৃতি বলে কোন কিছু থাকতে পারে না। শিক্ষা হল স্মৃতির পূর্ববর্তী শর্ত এবং শিক্ষা যথার্থ হয়েছে কিনা তা স্মৃতির সাহায্যে যাচাই করা হয়। কোন পাঠ শেখা হয়েছে কিনা তা বোঝা যাবে ওই পাঠটি এখন যথাযথভাবে মনে করতে পারছি কিনা।

কিছুসংখ্যক মনোবিদ শিক্ষণকে স্মৃতির কোন উপাদান বলে স্বীকার করেন না। সংবেদন, প্রত্যক্ষ, অনুভূতি ইত্যাদির মাধ্যমে শিক্ষণ নিষ্পন্ন হয়। পূর্ববর্তী শিক্ষা ছাড়া স্মৃতি সম্ভব নয় এই যুক্তিতে শিক্ষণকে স্মৃতির একটি অঙ্গ বলে গণ্য করলে একই যুক্তিতে সংবেদন, প্রত্যক্ষণ ইত্যাদিকেও স্মৃতির অঙ্গ বলে গণ্য করতে হয়, কেননা এদের বাদ দিয়ে স্মৃতি সম্ভব নয়।

কোন বিতর্কের মধ্যে না গিয়ে আমরা একথা বলতে পারি, শিক্ষা এবং মনে রাখা—এ দুটি প্রক্রিয়া একই সঙ্গে চলে। সেজন্য শিক্ষণকে স্মৃতির একটি অঙ্গ বা উপাদান বলে স্বীকার করাই ভাল।

(২) সংরক্ষণ বা ধারণ (Retention) ঃ আমরা যা কিছু শিখেছি তার সবকিছুই যে আমরা মনে করতে পারি তা নয়। স্মৃতির জন্য শিক্ষণ প্রয়োজনীয় হলেও শিক্ষণ মাত্রেই স্মৃতি নয়। সংবেদন, প্রত্যক্ষণ, শিক্ষণ প্রভৃতির মাধ্যমেই আমাদের মন অভিজ্ঞতা বা জ্ঞান অর্জন করে। এসবের মাধ্যমে যেসব অভিজ্ঞতা লাভ করি, তা যদি সঙ্গেসঙ্গেই ভুলে যাই তাহলে আমাদের জ্ঞানের অগ্রগতি বন্ধ হয়ে যাবে। অর্জিত অভিজ্ঞতাগুলিকে মনের মধ্যে ধরে না রাখতে পারলে শিক্ষণের কোন মূল্যই থাকে না। অভিজ্ঞতাগুলিকে মনের মধ্যে ধরে রাখার শক্তিকেই 'সংরক্ষণ' বলা হয়। প্রত্যক্ষের বিষয়গুলি আমাদের চেতনার উপর রেখাপাত করে। এসব রেখা মনের আসংজ্ঞান স্তরে স্মৃতিচিহ্নের আকারে সংরক্ষিত হয়। স্মরণ করার সময় আমরা এসব স্মৃতিচিহ্নকে প্রতিরূপের আকারে পুনরুজ্জীবিত করি। যেসব বিষয় শিক্ষা করা হয়েছে তা যদি মনের মধ্যে সংরক্ষিত না হয়, তবে ভবিষ্যতে সেগুলিকে স্মরণ করা একেবারেই সম্ভব হবে না। সুতরাং, 'সংরক্ষণ' হল স্মৃতির দ্বিতীয় উপাদান বা অঙ্গ।

নতুন ঘটনাকে প্রত্যক্ষ করা হয় তখন তা সংপ্রত্যক্ষণ (apperception)। প্রত্যক্ষেও পুরাতন অভিজ্ঞতার প্রভাব থাকলেও তা অজ্ঞাতসারে ঘটে থাকে। সংপ্রত্যক্ষণে সচেতনভাবে পুরাতন অভিজ্ঞতার সাহায্যে নতুন অভিজ্ঞতার ব্যাখ্যা করা হয়। প্রত্যক্ষণে সংবেদনই প্রধান। সংপ্রত্যক্ষণে অতীত অভিজ্ঞতার ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।

১৫। অধ্যাস বা ভ্রান্ত প্রত্যক্ষ কাকে বলে?

উত্তর ঃ বিপথগামী কল্পনার প্রভাবে কোন সংবেদনের ভুল ব্যাখ্যার ফলে যে বিকৃত প্রত্যক্ষ হয় তাকে অধ্যাস বলে।

১৬। অধ্যাস ও অমূল-প্রত্যক্ষের পার্থক্য নির্দেশ কর।

উত্তর ঃ ২৩নং, 'অধ্যাস ও অমূল-প্রত্যক্ষ' অংশ।

Philosophy (GE)
Sem-2
GE2-T
Philosophy of Mind

সপ্তম অধ্যায়

স্মৃতি [Memory]

1. Percept and Image. 2. Memory—its factors and range. 3. Marks of good memory. 4. Laws of Association. 5. Forgetfulness and its causes.

॥ ১ ॥ ভূমিকা ঃ

মনে রাখা বা স্মরণ করা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে একটি প্রয়োজনীয় কাজ। অতীত অভিজ্ঞতার কথা স্মরণ করতে পারি বলেই আমাদের পক্ষে এর আলোকে নতুন কোন অভিজ্ঞতাকে বুঝে নেওয়া কঠিন হয় না। শিক্ষণের ব্যাপারেও স্মরণ করার ক্ষমতা খুবই প্রয়োজনীয়। আমরা যা শিখেছি তার কতটুকু সুষ্ঠুভাবে স্মরণ করতে পারছি, তার উপরই আমাদের পেশাগত কৃতিত্ব নির্ভর করে। আমরা চিন্তার সাহায্যে জীবনের নানা প্রকার সমস্যার সমাধান করি। স্মরণ করার ক্ষমতার উপর চিন্তা নির্ভর করে। সুতরাং, শিক্ষণের ক্ষেত্রে স্মরণক্রিয়ার অবদান খুব মূল্যবান। শিক্ষার্থীর ক্ষেত্রেও স্মরণক্রিয়ার অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষার্থী যা শেখে তা মাঝে মাঝে স্মরণ করতে হয় এবং স্মরণক্রিয়ার মাধ্যমেই শিক্ষার্থীর শিক্ষা অগ্রসর হয়।

স্মরণক্রিয়ার গুরুত্ব

আমরা যখন কোন কিছু শিক্ষা করি, তখন শিক্ষণীয় বিষয় বা পরিস্থিতি আমাদের সম্মুখেই থাকে। কিন্তু বিষয়বস্তু আমাদের সম্মুখে না থাকলেও তার সম্বন্ধে আমরা চিন্তা করতে পারি। অতীত অভিজ্ঞতার একটি ছবি আমাদের মনের মধ্যে থাকে এবং বিষয়বস্তু আমাদের ইন্দ্রিয়ের সম্মুখে না থাকলেও এই মানসছবির সাহায্যেই আমরা বিষয়বস্তু সম্পর্কে চিন্তা বা ধারণা করতে পারি। বিষয়বস্তুর এই ছবিকে **প্রতিরূপ** (image) বলে, এবং বিষয়বস্তুকে মনে রাখা ও প্রয়োজনমত স্মরণ করাকেই বলে **স্মৃতি** (memory)।

স্মৃতি

যে প্রক্রিয়ার সাহায্যে মনের আসংজ্ঞান (preconscious) স্তরে অবস্থিত অতীত অভিজ্ঞতার চিহ্নগুলিকে প্রতিরূপের মাধ্যমে মনের চেতন স্তরে তুলে আনা হয়, তাকে 'কল্পনা' (imagination) বলে। এটিই হল 'কল্পনা' কথাটির সাধারণ অর্থ। এই অর্থে কল্পনাকে 'কল্পমূর্তি' (representation) বলা যেতে পারে। প্রতিরূপের মাধ্যমে অতীত অভিজ্ঞতাকে দু'ভাবে স্মরণ করা যায়। প্রথমতঃ, যে প্রতিরূপের মাধ্যমে অতীতের প্রত্যক্ষবস্তুকে পুনরুজ্জীবিত করা হচ্ছে, তা অতীতের প্রত্যক্ষবস্তুর হুবহু অনুরূপ (exact copy) হতে পারে, অথবা দ্বিতীয়তঃ, অনুরূপ না হয়ে ভিন্ন রূপ হতে পারে। প্রথম ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষবস্তুর সাথে প্রতিরূপের সম্পূর্ণ মিল আছে এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে প্রতিরূপটি একটি নতুন সৃষ্টি। প্রথম ধরনের কল্পনাকে বলা হয় 'অবিকল

দু'ভাবে প্রতিরূপ গঠিত হতে পারে

কাজেই ফাঁপা প্রান্তের মধ্যে অপর লাঠিটা ঢুকিয়ে দিলেই দুটি লাঠি যুক্ত হয়ে একটি লম্বা লাঠিতে পরিণত হবে এবং লম্বা লাঠির সাহায্যে কলা টেনে আনা যাবে। সুলতান নানাভাবে চেষ্টা করলো, কখনও হাত বাড়িয়ে, কখনও ছোট লাঠিটি দিয়ে, কখনও বড় লাঠি দিয়ে ; কিন্তু কিছুতেই কলার নাগাল পেল না। এর পর সুলতান একটি লাঠিকে খাঁচার বাইরে যত দূর যায় তত দূর পর্যন্ত ঠেলে দিল। পরে অপর লাঠিটি দিয়ে প্রথম লাঠিকে ঠেলতে ঠেলতে কলার গায়ে লাগিয়ে দিল। কলার গায়ে লাঠিটি লাগায় সুলতান খুব খুশী হলেও এর ফলে কলা পাওয়া গেল না। শেষ পর্যন্ত সুলতান যখন কোন প্রচেষ্টায় সমস্যার সমাধান করতে পারলো না, তখন কোহ্‌লার নিজে ফাঁপা লাঠিটার মুখে নিজের আঙ্গুল ঢুকিয়ে সুলতানকে সমস্যার সমাধান সম্পর্কে ইঙ্গিত দিলেন। কিন্তু সুলতানের নিকট এই ইঙ্গিত ব্যর্থ হল। প্রায় ঘণ্টা খানেক ব্যর্থ চেষ্টার পর সুলতান চেষ্টা করা ছেড়ে দিল। চেষ্টা করা ছেড়ে দিলেও সুলতান কিন্তু লাঠি দুটি নিয়ে নাড়াচাড়া করা ছাড়েনি। কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করার পরই সুলতান একটি লাঠি বাম হাতে ও অপরটি ডান হাতে নিয়ে ডান হাতের লাঠিটি বাম হাতের লাঠির ফাঁপা মুখে ঢুকিয়ে দিল। আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে সুলতান এই নতুন লম্বা লাঠি নিয়ে দৌড়ে খাঁচার ধারে গিয়ে কেবল যে কলা টেনে আনলো তাই নয়, আশেপাশে যত সব পাথরের ছোট ছোট নুড়ি ছিল সেগুলিকেও টেনে কাছে নিয়ে এল। পরদিন সুলতানকে আবার অনুরূপ সমস্যার সম্মুখীন করায় দেখা গেল যে, দুই-একবার চেষ্টার পরই সুলতান লাঠি দুইটি যুক্ত করে কলা টেনে আনতে সমর্থ হয়েছে।

কোহ্‌লারের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য পরীক্ষণের বর্ণনা

এই পরীক্ষণ থেকেও সমর্থিত হচ্ছে যে, সমস্যার বিভিন্ন অংশগুলিকে প্রথমে বিচ্ছিন্ন বলে মনে হলেও পরে তারা একটি সংগঠিত মূর্তি লাভ করে। গেস্টাল্ট মনোবিদ্‌গণের মতে, শিক্ষণ উদ্দীপক-প্রতিক্রিয়ার সংযোগসূত্র নয়। একটি পরিস্থিতি বা সমস্যার বিভিন্ন অংশের পারস্পরিক সম্পর্ক যখন অবধারণ করা হয়, উপাদানসমূহের পারস্পরিক সম্পর্ক ও এদের অর্থ সম্বন্ধে যখন একটি সমগ্র ছবি প্রাণীর সম্মুখে উদঘাটিত হয়, তখনই প্রাণীর 'পরিজ্ঞান' বা 'অন্তর্দৃষ্টি' (insight) জাগে। পরিজ্ঞানের সাহায্যেই শিক্ষণ নিষ্পন্ন হয়। শিম্পাঞ্জী অন্ধ 'প্রচেষ্টা ও ভুল সংশোধনে'র (trial and error) মাধ্যমে শিক্ষা করেনি, কিংবা মানুষের মতো বিচারবুদ্ধির সাহায্যেও সমস্যার সমাধান করেনি। সমগ্র অবস্থাটি যেন বিদ্যুৎ চমকের মতো তার দৃষ্টিতে উদ্ভাসিত হয়েছে।

শিক্ষণ উদ্দীপক প্রতিক্রিয়ার সংযোগসূত্র নয়, ইহা পরিজ্ঞানের সাহায্যে নিষ্পন্ন হয়

পরিজ্ঞান বা অন্তর্দৃষ্টি কোন রহস্যময় অতীন্দ্রিয় শক্তি নয়। সমস্যাটির পূর্ণরূপ যখন মনের মধ্যে সুস্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে এবং বিচ্ছিন্ন অংশগুলির সাথে সমগ্র সমস্যাটির সম্বন্ধ পরিপূর্ণরূপে বুঝতে পারা যায়, তখন তাকেই 'পরিজ্ঞান' বলা হয়। পরিস্থিতি সম্পর্কে সুস্পষ্ট এবং সামঞ্জস্যপূর্ণ রূপ ও অর্থ উপলব্ধি করার নামই 'পরিজ্ঞান'। পরিজ্ঞান এক রকমের প্রত্যক্ষণ-প্রক্রিয়া (mode of perception)।

পরিজ্ঞানের স্বরূপ

পরিজ্ঞানে প্রত্যক্ষণ-ক্ষেত্রের পুনর্বিন্যাস ঘটে। এই পুনর্বিন্যাস দুই ভাবে হতে পারে। একটি সরল ও সমগ্র পরিস্থিতির মধ্যে নতুন নতুন আরও খণ্ডাংশ যুক্ত করে পরিস্থিতিটির গণ্ডী বাড়ানো যেতে পারে। একে 'সমাকলন' (integration) বলে। অথবা, প্রথম দৃষ্টিতে যেসব উপাদানকে বিচ্ছিন্ন ও অসংলগ্ন বলে মনে হচ্ছে, তাদের অন্তর্নিহিত সঙ্গতি ও সম্পর্ক আবিষ্কৃত হতে পারে। একে 'গঠন' (structurisation) বলে। গেস্টাল্টবাদিগণের মতে, সকল প্রকার শিক্ষণের মূলে থাকে পরিজ্ঞান। এমন কি সাপেক্ষ প্রতিবর্তের সাহায্যে শিক্ষণের মধ্যেও পরিজ্ঞান থাকে। প্যাভ্‌লভের পরীক্ষণাধীন কুকুর কিংবা থর্নডাইকের বিড়ালের বেলায় পরিজ্ঞান খুব ধীর গতিতে জেগেছে। তবে পরিজ্ঞান সাধারণত হঠাৎ আলোর ঝলকানির মতো আবির্ভূত হয়। হার্টম্যান (Hartman) বলেন যে, পরিজ্ঞান এক ধরনের প্রত্যক্ষণ পদ্ধতি। একটি পরিস্থিতির বিভিন্ন অংশগুলি যতক্ষণ পর্যন্ত বিচ্ছিন্নভাবে প্রত্যক্ষ করা হয় ততক্ষণ পর্যন্ত পরিস্থিতির অখণ্ড রূপ ফুটে উঠতে পারে না, তা অসম্পূর্ণ থাকে। পরিস্থিতিটি সম্পূর্ণ দেখা যাচ্ছে না বলেই 'সমস্যা'র সৃষ্টি হয়েছে। যখনই পরিস্থিতিটির সম্পূর্ণ চিত্র অবধারণ করা যাবে, তখনই সমস্যারও সমাধান হয়ে যাবে।

শিক্ষণের ক্ষেত্রে গেস্টাল্টবাদিগণ প্রত্যক্ষকে (perception) প্রাধান্য দিয়ে থাকেন। শিক্ষণের মূলে আছে প্রত্যক্ষজনিত অবধারণ (perceptual comprehension)। প্রত্যক্ষের বেলায় বিষয়বস্তুতে কোন ফাঁক বা অসম্পূর্ণতা থাকলে আমরা তা অগ্রাহ্য করে বিষয়বস্তুকে পূর্ণ আকৃতিবিশিষ্ট মনে করি। শিক্ষণের ক্ষেত্রেও এই ফাঁক পূরণ (closure) ঘটে থাকে। শিম্পাঞ্জী খাঁচার মধ্যে আছে, এর বাইরে রয়েছে কলা। কিন্তু এই দুইয়ের মধ্যে 'ফাঁক' রয়েছে। শিম্পাঞ্জীর মনে হল যে, লাঠি দুটি একত্র করলে কলার নাগাল পাওয়া যাবে। শিম্পাঞ্জী আছে খাঁচার ভিতরে, বাইরে বেশ কিছু দূরে আছে কলা, খাঁচার মধ্যে আছে দুটি লাঠি। শিম্পাঞ্জী সবই দেখতে পাচ্ছে, কিন্তু এই সবের পারস্পরিক সম্পর্ক অনুধাবন করতে পারছে না বলে সমগ্র চিত্রটি তার সম্মুখে ফুটে উঠতে পারছে না। যে মুহূর্তে সে বুঝে উঠতে পারলো যে, খাঁচা এবং কলার মধ্যেকার 'ব্যবধান' (gap) লাঠি দুটি যুক্ত করলেই অতিক্রম করা যায়, সেই মুহূর্তেই খাঁচা-কলা-দুটি-লাঠিরূপ সমগ্র পরিস্থিতির 'পুনর্বিন্যাস' ঘটলো এবং শিম্পাঞ্জীর মধ্যে পরিজ্ঞানের উদ্ভব হল।

শিক্ষণের মূলে থাকে প্রত্যক্ষজনিত অবধারণ

শিক্ষণের ক্ষেত্রে ফাঁক বা ব্যবধান পূরণের প্রক্রিয়া কর্তমান

এইজন্যই গেস্টাল্টবাদিরা বলেন যে, সমস্ত শিক্ষণই সমস্যার সমাধান (all learning is problem-solving)। সমস্যার সমাধান বলতে তাঁরা ব্যক্তির অতীত অভিজ্ঞতার পুনর্গঠন (re-structurisation) বুঝে থাকেন। শিক্ষণের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে কফ্‌কা (Koffka) তাই বলেছেন যে, শিক্ষণ হল পরিবেশ বা পরিস্থিতির নতুন গঠন ও বিন্যাস (re-organisation of the situation)। এই নতুন গঠন ও বিন্যাস এক চমকে ঘটে থাকে, অন্ধ প্রচেষ্টার ফলে বা ক্রমিকভাবে ঘটে না।

শিক্ষণে পরিস্থিতির পুনর্বিন্যাস ঘটে

এই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে দ্বিতীয় পাত্রটিই 'অধিকতর গাঢ়'। এ থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, মুরগীর মতো নির্বোধ প্রাণীও বিচ্ছিন্ন উদ্দীপকে প্রতিক্রিয়া না করে উদ্দীপকসমূহের পারস্পরিক সম্পর্ক প্রত্যক্ষ করে প্রতিক্রিয়া করে। কোহ্‌লার শিম্পাঞ্জী এবং মানব শিশুর ক্ষেত্রেও এই ধরনের পরীক্ষণ করে একই ফল পেয়েছেন। কোহ্‌লার তাই বলেছেন যে, মানুষ কোন পরিস্থিতির বিচ্ছিন্ন অংশে প্রতিক্রিয়া করে না, পারস্পরিক সম্বন্ধে যুক্ত একটি সমগ্র পরিস্থিতিকে অবধারণ করে এবং প্রতিক্রিয়া করে।

শিক্ষণ সম্পর্কে শিম্পাঞ্জী নিয়ে কোহ্‌লার যে-সব পরীক্ষণ করেছেন, তা মনোবিদ্যার ইতিহাসে খুবই প্রসিদ্ধিলাভ করেছে। আফ্রিকার উপকূলভাগে ক্যানারি দ্বীপপুঞ্জের টেনেরিফ্ (Tenerife) দ্বীপে ১৯১৩ থেকে ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে কোহ্‌লার শিম্পাঞ্জী নিয়ে এইসব পরীক্ষণ করেন। একটি পরীক্ষণে কোহ্‌লার একটি ক্ষুধার্ত শিম্পাঞ্জীকে খুব উঁচু ছাদবিশিষ্ট একটি খাঁচার ভিতর রেখে ছাদ থেকে কলা ঝুলিয়ে দিলেন এবং একটি হালকা বাক্স এক কোণে ফেলে রাখলেন। যেখান থেকে কলা ঝুলছে তার নিচে বাক্সটিকে টেনে এনে বাক্সের উপর চড়ে লাফ দিলেই কলার নাগাল পাওয়া যায়। কিন্তু শিম্পাঞ্জীটি এর পূর্বে কখনও বাক্সের সাহায্য নিয়ে কিছু করেনি বলে বাক্সটির কোন সার্থকতা বুঝতে পারলো না। শিম্পাঞ্জী বহুক্ষণ ধরে লাফালাফি করলো, দেওয়াল বেয়ে ওঠার চেষ্টা করলো, কিন্তু কলার নাগাল পেল না। অবশেষে পরীক্ষক নিজে খাঁচার মধ্যে ঢুকে বাক্সটি টেনে এনে এবং তার উপর চড়ে দেখিয়ে দিলেন কি ভাবে কলার নাগাল পাওয়া যায়। এরপর তিনি বাক্সটি ঠেলে দূরে সরিয়ে দিয়ে খাঁচার বাইরে চলে এলেন। সঙ্গে সঙ্গেই শিম্পাঞ্জী বাক্সটি টেনে এনে কলার ঠিক নিচে রেখে তার উপর চড়লো ও লাফ দিয়ে কলা ছিঁড়ে নিল।

শিম্পাঞ্জী নিয়ে একটি পরীক্ষণের বর্ণনা

কোহ্‌লার এই পরীক্ষণই অপর একটি শিম্পাঞ্জীকে নিয়ে করেছেন। এই দ্বিতীয় শিম্পাঞ্জীটি মোটেই বুদ্ধিমান নয়। এই শিম্পাঞ্জীটি অন্যান্য শিম্পাঞ্জীকে বাক্সের উপর চড়ে কলা পেড়ে আনতে দেখেছে, কিন্তু নিজে কোনদিন হাতে-কলমে এইভাবে চেষ্টা করেনি। শিম্পাঞ্জীটি অন্যান্য শিম্পাঞ্জীর কার্যকলাপ থেকে কিছু শিক্ষা লাভ করেছে কিনা জানার জন্য কোহ্‌লার শিম্পাঞ্জীটিকে অনুরূপ পরিস্থিতির মধ্যে ছেড়ে দিলেন। দেখা গেল শিম্পাঞ্জীটি উক্ত পরিস্থিতির কোনই সদ্ব্যবহার করতে পারছে না। শিম্পাঞ্জী দৌড়ে বাক্সের কাছে গেল ; কিন্তু বাক্সকে টেনে কলার নিচে না এনে সে বাক্সর উপর চড়ে বসল এবং নানা রকম লম্ফ-ঝম্ফ শুরু করে দিল। কখনও আবার বাক্স থেকে নেমে মেঝে থেকেই লাফ দিয়ে কলা ধরার চেষ্টা করলো।

কোহ্‌লার বলেছেন যে, এই পরীক্ষণ থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, পরিস্থিতিকে সমগ্রভাবে প্রত্যক্ষ করতে না পারলে কি ধরনের প্রতিক্রিয়া করতে হবে তা শিক্ষা করা যায় না। প্রথম শিম্পাঞ্জীটি যতক্ষণ পর্যন্ত দেখিয়ে দেওয়া না হয়েছে, ততক্ষণ পর্যন্ত বাক্স এবং কলার মধ্যে কোন সম্বন্ধ স্থাপন করতে পারেনি। যখনই এই সম্বন্ধটি স্পষ্ট হয়েছে, তখন বাক্সটি আর

বিচ্ছিন্ন একটি বাক্স থাকেনি। তা তখন খাদ্য লাভ করার 'সহায়ক' (implement) বা উপায়ে পরিণত হয়েছে। গেস্টাল্টবাদিগণের ভাষায়, যে মুহূর্তে অংশগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক বুঝতে পারা গিয়েছে, সেই মুহূর্তেই 'ছেদ বা ফাঁক পূরণ' (closure) হয়েছে। দ্বিতীয় শিম্পাঞ্জীটিও জানতো যে, কলার নাগাল পেতে হলে বাক্স এবং লাফ দেওয়া উভয়ই প্রয়োজন। কিন্তু এদের কিভাবে সম্বন্ধযুক্ত করলে পরিস্থিতি সমগ্রতা লাভ করবে এবং এইসব বিচ্ছিন্ন জিনিস অর্থপূর্ণ হবে তা শিম্পাঞ্জীটি বুঝে উঠতে পারেনি।

পরিস্থিতিকে সমগ্রভাবে অবধারণ করতে না পারলে সঠিক প্রতিক্রিয়া শেখা যায় না

শিম্পাঞ্জী নিয়ে কোহ্‌লার যেসব পরীক্ষণ করেছেন তাদের মধ্যে সুলতান নামে একটি শিম্পাঞ্জীকে নিয়ে পরীক্ষণই খুব মনোজ্ঞ ও চমকপ্রদ। কোহ্‌লারের পরীক্ষণাধীন শিম্পাঞ্জীগুলির মধ্যে সুলতানই সর্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান ছিল। সুলতানকে একটি খাঁচার মধ্যে রাখা হল এবং খাঁচার বাইরে কিছু দূরে কলা রাখা হল। খাঁচার মধ্যে দুটি লাঠি রাখা ছিল। একটি লাঠি ছোট ও সরু, অপরটি অপেক্ষাকৃত বড় ও মোটা। কিন্তু ওই দুটি লাঠির কোনটির সাহায্যেই খাঁচার বাইরে রাখা কলার নাগাল পাওয়া যায় না। লাঠি দুটির মধ্যে বড় লাঠিটির দুই দিকেই ফাঁপা।

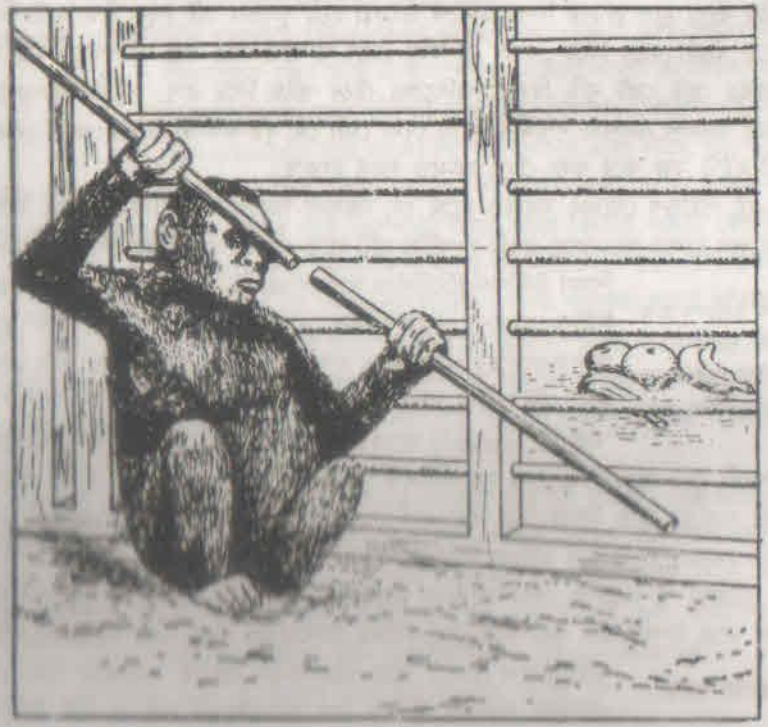

থাক' ব্যবহার করে ধাঁধার বাক্স খুলে ফেললো। এইসব পরীক্ষণের মাধ্যমে 'সহায়ক সাপেক্ষীকরণ'-প্রক্রিয়া সম্পর্কে যে সব তথ্য পাওয়া গিয়েছে, তা শিক্ষণ সম্পর্কে আচরণবাদিদের মতবাদকে অনেকটা দুর্বল করে ফেলেছে। আবার, এই ধরনের পরীক্ষণ থর্নডাইকের শিক্ষণ সংক্রান্ত মতবাদের মূলেও কুঠারাঘাত করেছে। শিক্ষণ নিছক যান্ত্রিক প্রক্রিয়া নয়, শিক্ষণের মধ্যে আচরণে বৈচিত্র্য এনে উপযুক্ত আচরণ বেছে নেবার ব্যাপার রয়েছে, এবং যে আচরণটি বেছে নেওয়া হয় তা স্বাভাবিক ও মূল আচরণ থেকে ভিন্নতর।

॥ ৫ ॥ শিক্ষণের ব্যাখ্যায় পরিজ্ঞানবাদ বা গেস্টাল্ট মতবাদ (The Insight Theory or The Gestalt Theory of hearing) :

গেস্টাল্ট্ বা সমগ্রতাবাদি মনোবিদ্‌গণ থর্নডাইকের 'প্রচেষ্টা ও ভুল সংশোধন' মতবাদের বিরূপ সমালোচনা করেছেন। থর্নডাইক যে সব পরীক্ষণ করেছেন, তাতে দেখা যায় যে, একটি বিশেষ লক্ষ্যে উপনীত হতে হলে যে ধরনের ক্রিয়া করার দক্ষতা প্রয়োজন তাঁর পরীক্ষণাধীন প্রাণী সেই দক্ষতা শিক্ষা করেছে মাত্র। বস্তুত, থর্নডাইকের পরীক্ষণসমূহের উদ্দেশ্যই যেন ছিল প্রাণীকে এই ধরনের দক্ষতা অর্জনে সাহায্য করা। এই সকল পরীক্ষণের ভিত্তিতেই থর্নডাইক সিদ্ধান্ত করলেন যে, 'প্রচেষ্টা ও ভুল সংশোধন' নীতির সাহায্যেই প্রাণী শিক্ষালাভ করে এবং এটিই হল সকল প্রকার শিক্ষণের মূল নীতি। পরীক্ষণকালে থর্নডাইক পরীক্ষণাধীন প্রাণীকে এমন পরিস্থিতিতে স্থাপন করেছেন, যেখানে প্রাণীর প্রত্যক্ষের ক্ষেত্র খুব সীমাবদ্ধ এবং ওই সীমাবদ্ধ প্রত্যক্ষ-ক্ষেত্রের মধ্যে সমস্যার সমাধানের কোন ইঙ্গিতই নেই।

থর্নডাইকের পরীক্ষাধীন প্রাণীর প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে খুবই সীমাবদ্ধ ছিল

শিক্ষণের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষের গুরুত্বপূর্ণ অবদানের প্রতি গেস্টাল্টবাদি মনোবিদ্ কোহ্‌লার (Kohler) সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। কোহ্‌লার বলেন যে, থর্নডাইক যে ধরনের খাঁচা ব্যবহার করেছেন তা বিড়ালের পক্ষে বেশ কঠিন ছিল। খাঁচার দরজার ছিটকিনি বিড়ালের প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রের মধ্যে ছিল না বলেই বিড়ালকে বারবার ভুল প্রচেষ্টা করতে হয়েছে। সমগ্র পরিস্থিতি যদি প্রত্যক্ষের আওতার মধ্যে না থাকে, তাহলে মানুষও কোন সমস্যার সমাধানে বিড়ালের মতো আচরণ করবে। মনে করা যাক একটি মানুষকে একটি ঘরের মধ্যে বন্দী করে রাখা হয়েছে। ওই ঘরের কোন একটি জায়গায় একটি বৈদ্যুতিক বোতাম আছে। বোতামটি টিপলেই ঘরের দরজা খুলে যাবে। কিন্তু বোতামটি কোথায় আছে, কিংবা ঘর থেকে বের হতে হলে কি করতে হবে—এইসব সম্পর্কে কোন ইঙ্গিতই মানুষটিকে দেওয়া হয়নি। এক্ষেত্রে মানুষটি ঘর থেকে বের হবার জন্য অন্ধের মতো এলোপাতাড়ি চেষ্টা করবে।[৮] এই জন্যই কোহ্‌লার অভিযোগ করেছেন যে, থর্নডাইক তাঁর পরীক্ষণাধীন প্রাণীর

শিক্ষণের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষের গুরুত্বপূর্ণ অবদান আছে

৮ G. D. Boaz : General Psychology, p 273

নিকট জটিল এবং কঠিন সমস্যা স্থাপন করেছেন। সমগ্র সমস্যা ও তার সমাধানের সূত্র ওইসব প্রাণীর প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রের মধ্যে উপস্থিত ছিল না। সংক্ষেপে, প্রাণী পরিস্থিতিকে সমগ্রভাবে অবধারণ করতে সমর্থ হয়নি বলেই এত রকমের ভুল প্রচেষ্টা করতে হয়েছে।

গেস্টাল্টবাদিগণের মতে, শিক্ষণ কোন অন্ধ ও যান্ত্রিক প্রক্রিয়া নয়। শিক্ষণ-প্রক্রিয়ার মধ্যে সমগ্র পরিস্থিতি সম্পর্কে পরিজ্ঞান বা অন্তর্দৃষ্টি (insight) থাকে। দ্রুত শিক্ষণের অনেক নমুনা দেখিয়ে কোহ্‌লার বলেন যে, এইসব নমুনা থেকে প্রমাণিত হয় যে, প্রাণী সমস্যাটির বিভিন্ন অংশের পারস্পরিক সম্বন্ধ বুঝে নিতে পেরেছে। যেখানেই প্রাণীর পক্ষে সমস্যাটি সমগ্রভাবে অবধারণ করা সম্ভব হয়, সেখানেই প্রাণীর আচরণে পরিজ্ঞান বা অর্ন্তদৃষ্টির পরিচয় পরিস্ফুট হয়। থর্নডাইক তাঁর পরীক্ষণাধীন প্রাণীর আচরণে যে সব 'বোকার মত ভুল' (stupid errors) লক্ষ্য করেছেন, তা তখনই দেখা যায়, যখন সমস্যাটি প্রাণীর পক্ষে কঠিন থাকে। গেস্টাল্টবাদি কফ্‌কা (Koffka) বলেন যে, থর্নডাইক যেসব খাঁচা ব্যবহার করেছেন সেগুলি তাঁর পরীক্ষণাধীন বিড়ালের পক্ষে খুবই জটিল ও কঠিন ছিল এবং সেইজন্যই খাঁচা থেকে বাইরে আসার চেষ্টায় বিড়াল এলোপাতাড়ি আচরণ করেছে।

শিক্ষণ প্রক্রিয়ায় সমগ্র পরিস্থিতি সম্পর্কে অন্তদৃষ্টি থাকে

শিক্ষণের ক্ষেত্রে যখন আমরা কোন প্রতিক্রিয়া করি, তখন কি আমরা কোন বিশেষ উদ্দীপকে প্রতিক্রিয়া করি, না, বাহ্য পরিবেশের বিভিন্ন উদ্দীপকের মধ্যে যে সম্বন্ধ রয়েছে তাতে প্রতিক্রিয়া করি? এ প্রশ্নের সমাধানে কোহ্‌লার একটি মনোজ্ঞ পরীক্ষণ করেছেন। তিনি দুটি মুরগীকে একটি তারের খাঁচার মধ্যে রেখে খাঁচার বাইরে দুটি কাঠের পাত্রে শস্যকণা রাখলেন। এই দুটি কাঠের পাত্রের মধ্যে একটি হালকা রঙের এবং অপরটি গাঢ় রঙের। পাত্র দুটি খাঁচার নিকট এমনভাবে রাখা হল যে, দরজা একটু ফাঁক করলেই যাতে মুরগী খাঁচা থেকে কেবল গলা বাড়িয়ে পাত্র থেকে শস্যকণা খেতে পারে। যখনই মুরগী হাল্‌কা রঙের পাত্র থেকে শস্যকণা খাওয়ার চেষ্টা করে, তখন মুরগীকে ভয় দেখিয়ে বাধা দেওয়া হয়, কিন্তু গাঢ় রঙের পাত্র থেকে শস্যকণা খেতে গেলে কোন বাধাই দেওয়া হয় না। মাঝে মাঝে আবার পাত্র দুটির স্থান পরিবর্তন করা হত, অর্থাৎ হালকা রঙের পাত্রটি গাঢ় রঙের পাত্রের জায়গায় এবং গাঢ় রঙের পাত্রটি হালকা রঙের পাত্রের জায়গায় রাখা হত। ৪০০ থেকে ৬০০ বার পরীক্ষণের পর মুরগী দুটি হালকা রঙের পাত্র পরিহার করে গাঢ় রঙের পাত্র থেকে শস্য কণা গ্রহণ করার অভ্যাস আয়ত্ত করে ফেললো। এর পর শুরু হল কোহ্‌লারের চূড়ান্ত পরীক্ষণ। তিনি গাঢ় রঙের পাত্র যেমন আছে তেমনই রাখলেন, কিন্তু হাল্‌কা রঙের পাত্র সরিয়ে দিয়ে সেখানে অধিকতর গাঢ় রঙের একটি পাত্র রাখলেন এবং উভয় পাত্রেই সম পরিমাণ শস্যকণা রাখলেন। দেখা গেল যে, মুরগী দুটি পূর্বেকার অভ্যস্ত গাঢ় রঙের পাত্রের দিকে না গিয়ে অধিকতর গাঢ় রঙের পাত্র থেকে শস্যকণা গ্রহণ করছে।

কোহ্‌লারের মুরগী নিয়ে পরীক্ষণের বর্ণনা

পারস্পরিক সম্বন্ধে যুক্ত একটি মাত্র পরিস্থিতি প্রত্যক্ষ করে প্রতিক্রিয়া করা হয়

অবস্থার সাহায্য ছাড়াই এ মতবাদ শিক্ষণ প্রক্রিয়ার ব্যাখ্যা দান করেছে। ফললাভের সূত্রের সাহায্য না নিলেও সাপেক্ষীকরণ তত্ত্ব 'অনুশীলনের সূত্র'কে গ্রহণ করেছে। নিরপেক্ষ উদ্দীপকের (unconditioned stimulus) সাথে সাপেক্ষ উদ্দীপকটিকে (conditioned stimulus) বারংবার উপস্থাপিত করলে তবে সাপেক্ষ প্রতিবর্ত ক্রিয়া প্রতিষ্ঠিত হয়। শিশুর শিক্ষণ যে মূলত সাপেক্ষ প্রতিবর্ত ক্রিয়া প্রতিষ্ঠা করা, তা অনেকেই স্বীকার করেন। সুতরাং, উপযুক্ত পারিপার্শ্বিকের সৃষ্টি করে শিশুকে প্রয়োজনীয় বিষয় শিক্ষা দেওয়া যায়—এর প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে সাপেক্ষীকরণ তত্ত্ব শিক্ষণের ক্ষেত্রে অমূল্য অবদান রেখেছে।

শিক্ষণের ক্ষেত্রে সাপেক্ষীকরণ তত্ত্বের অবদান

শিক্ষণের ক্ষেত্রে সাপেক্ষীকরণ তত্ত্বের এই প্রকার অবদান সত্ত্বেও একথা বলতে পারা যায় যে তত্ত্বটি নেহাৎ যান্ত্রিক তত্ত্ব। এই তত্ত্বে শিক্ষার্থীর ইচ্ছা, মনোযোগ, আগ্রহের কোন মূল্যই স্বীকৃত হয়নি। শিক্ষণ কেবল সাপেক্ষ প্রতিবর্ত ক্রিয়ার শৃঙ্খল প্রতিষ্ঠা করা নয়। শিক্ষণ একটি সহযোগিতা ও সংগঠনমূলক প্রক্রিয়া এবং এই প্রক্রিয়ায় দেহমন-সম্পন্ন জীব সমগ্রভাবে অংশগ্রহণ করে।

সাপেক্ষীকরণ তত্ত্ব একটি যান্ত্রিক তত্ত্ব

শিক্ষণ সম্পর্কে ওয়াট্‌সনের মতবাদও প্যাভ্‌লভের মতবাদ অপেক্ষা কোন অংশেই উন্নত মতবাদ নয়। অনুশীলনের সূত্রকেই ওয়াট্‌সন্ শিক্ষার একমাত্র সূত্র বলে গ্রহণ করেছেন। ওয়াট্‌সনের মতে থর্নডাইক বর্ণিত বিড়াল অনেকবার চেষ্টা করেছিল বলেই খাঁচার দরজার ছিটকিনি খোলার কৌশল আয়ত্ত করতে পেরেছিল। এর সাথে প্রীতিকর অবস্থার কোনই সম্পর্ক নেই। কিন্তু ওয়াট্‌সনের এই যুক্তি বিশ্বাসযোগ্য মনে হয় না। বিড়ালটি নানাপ্রকার ব্যর্থ আচরণও করেছিল এবং পরবর্তী প্রচেষ্টাসমূহে এইসব ব্যর্থ আচরণের পুনরাবৃত্তিও করেছিল। কিন্তু যে আচরণের ফলে খাঁচা থেকে বের হওয়া গিয়েছিল তা-ই কেবল বিড়ালটি শিখেছে। অতএব, ফললাভের সূত্রকে বর্জন করা যায় না। শিক্ষণের ব্যাখ্যায় ফললাভের সূত্রের প্রয়োজনীয়তা মনোবিদ্ ডান্‌ল্যাপ্ (Dunlap) সমর্থন করেছেন। টাইপ করার সময় 'the' কথাটি ডান্‌ল্যাপের হাতে 'hte' হয়ে যেত। এজাতীয় ভুল যাতে না হয় তার জন্য তিনি সজ্ঞানে ও সচেতনভাবে ইচ্ছা করে 'hte' কথাটি শতাধিক বার টাইপ করলেন। এর ফলে 'hte' কথাটি তাঁর নিকট এত বিরক্তিকর বলে বোধ হল যে, তিনি ভবিষ্যতে 'the' টাইপ করতে আর ভুল করতেন না। কেবল অনুশীলনের ফলেই যদি শিক্ষণ নিষ্পন্ন হয়, তাহলে ডান্‌ল্যাপের ক্ষেত্রে 'hte' টাইপ করাই নিয়ম হয়ে যেত, কেননা 'hte' কথাটি বারংবার টাইপ করা হয়েছিল। এইসব কারণে ম্যাক্‌ডুগল, কফ্‌কা, কোহ্‌লার প্রমুখ মনোবিদ্‌গণ প্যাভ্‌লভ ও ওয়াট্‌সনের শিক্ষণ-সম্পর্কিত মতবাদকে অতিমাত্রায় যান্ত্রিক মতবাদ বলে অভিহিত করেছেন এবং এই মতবাদ যে সন্তোষজনক নয় তাও বলেছেন।

অনুশীলনের সূত্রই একমাত্র সূত্র নয়

বেক্‌টেরেভ্ মানুষ নিয়ে সাপেক্ষীকরণের যে সব পরীক্ষণ করেছেন সেই সূত্র ধরে আর এক ধরনের সাপেক্ষীকরণ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয় এবং তা 'সহায়ক সাপেক্ষীকরণ'

(Instrumental conditioning) নামে পরিচিত। এই পরীক্ষণে 'স্বাভাবিক উদ্দীপক' হল বিদ্যুতের ধাক্কা, 'সাপেক্ষ উদ্দীপক' একটি ঘণ্টাধ্বনি এবং প্রতিক্রিয়া হিসাবে একটি পা উঁচুতে তুলতে হবে। প্যাভ্‌লভ যে পরীক্ষণ করেছিলেন তাতে পুরস্কার অর্থাৎ খাদ্য লাভ করার জন্য কুকুরকে কিছুই করতে হত না। কুকুরের শুধু নিষ্ক্রিয় ভূমিকা। কুকুরের মুখ থেকে যে লালা নিঃসরণ হত তা গ্রন্থিসংক্রান্ত প্রতিবর্তক্রিয়া। বেক্‌টেরেভ্ যে সব পরীক্ষণ করেছেন তা প্যাভ্‌লভকৃত পরীক্ষণ থেকে একটু স্বতন্ত্র ধরনের। কেননা, বেক্‌টেরেভের পরীক্ষণে পরীক্ষণ-পাত্রকে সক্রিয়ভাবে কিছু করতে কিংবা কিছু শিখতে হত। যেহেতু এই সক্রিয়তা সঠিক প্রতিক্রিয়ার সহায়ক, সেইহেতু এই ধরনের পরীক্ষণকে 'সহায়ক সাপেক্ষীকরণ' বলা হয়।

সহায়ক সাপেক্ষীকরণ

সহায়ক সাপেক্ষীকরণ সম্পর্কে বিভিন্ন পরীক্ষণ থেকে শিক্ষণ-প্রক্রিয়ার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে নানা তথ্য পাওয়া গিয়েছে। শিক্ষণ যে শুধু একটি প্রতিক্রিয়া ও বিকল্প উদ্দীপকের মধ্যে সংযোগ সাধন নয় তা প্রমাণিত হয়েছে। এও দেখা গিয়েছে যে, শিক্ষণ-প্রক্রিয়া বলতে কেবল 'ক্রমিক প্রতিবর্ত ক্রিয়া' গঠন করা বোঝায় না। যেমন—একটি কুকুরকে যদি বিদ্যুতের ধাক্কা দেওয়া হয়, তাহলে কুকুরটির যে স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া হবে তা চমকে ওঠার মতো প্রতিক্রিয়া এবং এই প্রতিক্রিয়াতে কুকুরের সর্বদেহে, সর্ব অঙ্গে একটা চাঞ্চল্য দেখা যাবে। এখন, এই কুকুরটিকে যদি ঘণ্টাধ্বনিতে সাপেক্ষীকৃত করা হয়, তাহলে প্রথম দিকে ঘণ্টাধ্বনি শুনেও কুকুর চমকে উঠবে এবং তার সর্বাঙ্গে একটা আলোড়নের সৃষ্টি হবে। কিন্তু অত্যল্পকালের মধ্যেই কুকুরটি তার একটি পা মাটি থেকে উঁচুতে তুলে বিদ্যুতের ধাক্কা পরিহার করতে শিখে যায়।

সহায়ক সাপেক্ষীকরণ সংক্রান্ত পরীক্ষণ-লব্ধ ফলাফল

প্যাভলভের শিক্ষাতত্ত্ব কিংবা আচরণবাদীদের শিক্ষাতত্ত্ব সমর্থন করে না

এখানে বলা বাহুল্য যে, পা তুললে বিদ্যুতের ধাক্কা দেওয়া হয় না এবং বিদ্যুৎ চমকের সঙ্গে সঙ্গে ঘণ্টাধ্বনি করা হয়। ফলে ঘণ্টাধ্বনি বিদ্যুৎ তরঙ্গের বিকল্প উদ্দীপকে পরিণত হয় এবং ঘণ্টাধ্বনি শোনামাত্র কুকুর তার পা তুলে ধরে। এই পরীক্ষণ থেকে দেখা যাচ্ছে যে, আগে ঘণ্টাধ্বনি শুনে কুকুরের সর্বাঙ্গে যে ব্যাপক আলোড়ন হত তা এখন সংক্ষিপ্ত হয়ে শুধু একটি অঙ্গের প্রতিক্রিয়ায় পরিণত হয়েছে। কাজেই আমরা বলতে পারি, কুকুরটি যা শিখেছে তা শুধু ক্রমিক প্রতিবর্তী ক্রিয়া নয়। তা ছাড়া, কুকুরের পরবর্তী প্রতিক্রিয়া পূর্ববর্তী স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া থেকেও অনেকাংশে ভিন্ন ধরনের। অর্থাৎ কুকুরটি নতুন পরিস্থিতিতে যে প্রতিক্রিয়া উপযুক্ত সেই প্রতিক্রিয়া করতে শিখেছে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যে নিছক একটি সংযোগসূত্র প্রতিষ্ঠার পরিবর্তে শিক্ষণে প্রাণী বর্তমান পরিস্থিতির চাহিদা বা দাবী অনুযায়ী নিজেকে খাপ খাইয়ে নেবার চেষ্টা করে। লাশ্‌লি (Lashley)-ও এই ধরনের পরীক্ষণ করেছেন বানর নিয়ে। একটি বানরকে তার একটি পায়ের থাবা দিয়ে একটি বাঁধার বাক্স খোলার কায়দা শেখানো হয়েছিল। এর পর বানরের উক্ত পা সাবধানে বাধা সৃষ্টি করা হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও বানরটি তার অন্য পায়ের

সাপেক্ষ প্রতিবর্ত-ক্রিয়া (Conditioned Reflex) ঃ বিশেষ প্রতিক্রিয়ার জন্য বিশেষ উদ্দীপকের প্রয়োজন হয়। কিন্তু এই বিশেষ প্রতিক্রিয়াটি তার নির্দিষ্ট উদ্দীপক ছাড়া অন্য কোন বিকল্প উদ্দীপকের সাহায্যে ঘটতে পারে কিনা তা প্যাভ্‌লভ (Pavlov) আলোচনা করেছেন।

সাপেক্ষ প্রতিবর্ত ক্রিয়া ও প্যাভ্‌লভের পদ্ধতি

একটি কুকুরকে নানা রকমের খাদ্য খেতে দিয়ে তার মুখ থেকে কি পরিমাণ লালা নিঃসৃত হচ্ছে তা তিনি লক্ষ্য করলেন এবং লালার পরিমাণ মাপবার জন্য একটি যন্ত্র উদ্ভাবন করলেন। প্যাভ্‌লভ লক্ষ্য করলেন যে, অভ্যস্ত কুকুরের ক্ষেত্রে জিভের সাথে খাবারের সংস্পর্শ ঘটায় পূর্বেই খাবার দেখেই কিংবা খাবার নিয়ে সচরাচর যে ব্যক্তি আসে তাকে দেখেই তার লালা নিঃসরণ হতে থাকে। তখন তিনি কুকুরটিকে প্রতিবার খাবার দেবার সময় একটি ঘণ্টা বাজাতে লাগলেন। পরে লক্ষ্য করলেন যে, শুধু ঘণ্টার শব্দ শুনেই কুকুরটির মুখ থেকে লালা নিঃসৃত হচ্ছে।

কুকুরের উপর পরীক্ষা

জিহ্বার সাথে খাদ্যের সংস্পর্শ ঘটলে আপনা আপনি লালা নিঃসৃত হয়। এখানে লালা নিঃসরণ হল প্রতিবর্ত-ক্রিয়া (reflex action)। কিন্তু কুকুরটির ক্ষেত্রে শুধু ঘণ্টার শব্দ শুনেই লালা নিঃসৃত হচ্ছে। এক্ষেত্রে, ঘণ্টার শব্দ হল সাপেক্ষ উদ্দীপক (conditioned stimulus) এবং ঘণ্টার শব্দ শুনে লালা নিঃসরণকে সাপেক্ষ প্রতিবর্ত-ক্রিয়া (conditioned reflex) বলে।

সাপেক্ষ প্রতিবর্ত ক্রিয়ার স্বরূপ

শিক্ষণ সম্পর্কে মতবাদ ঃ শিক্ষণ সম্পর্কে গবেষণার উদ্দেশ্যে প্যাভ্‌লভ (Pavlov) সাপেক্ষ প্রতিবর্ত-ক্রিয়া নিয়ে পরীক্ষণ করেননি। তা হলেও তিনি মনে করেন যে, সাপেক্ষীকরণ (conditioning) পদ্ধতির সাহায্যে সর্বপ্রকার শিক্ষণের সন্তোষজনক ও বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা করা যায়। প্যাভ্‌লভের মতে, **শিক্ষণ হল একাধিক সাপেক্ষ প্রতিবর্ত-ক্রিয়ার শৃঙ্খল**। পরবর্তীকালে আচরণবাদিগণ (Behaviourists) সাপেক্ষীকরণ তত্ত্বের সাহায্যে সর্বপ্রকার শিক্ষণের ব্যাখ্যা করেছেন। একথা অনস্বীকার্য যে, শিক্ষণ সংক্রান্ত কোন মতবাদই প্যাভ্‌লভের সাপেক্ষীকরণ তত্ত্বকে বর্জন করে সম্পূর্ণাঙ্গ হতে পারে না।

সাপেক্ষীকরণ পদ্ধতির সাহায্যে শিক্ষার ব্যাখ্যা

প্যাভলভের মতে সকল প্রকার শিক্ষণের মূলসূত্র হল 'সাপেক্ষীকরণ-অনাপেক্ষীকরণ' (conditioning-deconditioning)। রাস্তায় লাল আলো দেখামাত্র মোটরগাড়ীচালক গাড়ী থামায় এবং সবুজ আলো জ্বলে উঠলেই গাড়ী চালাতে শুরু করে। এটি কিন্তু চালকের স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া নয়। এ হল সাপেক্ষীকরণের ফল। লাল আলো দেখা মাত্র কোনরূপ চিন্তা না করে মোটরের ব্রেক কষে মোটর থামাবার প্রতিক্রিয়াটিতে চালককে অভ্যস্ত হতে হয়েছে, কেননা চালক জানে যে, এ রকম প্রতিক্রিয়া না করতে পারলে তাকে নিশ্চিত শাস্তি পেতে হবে। শিশুও সকল প্রকার শিক্ষা এভাবেই লাভ করে থাকে। শিক্ষক ক্লাসঘরে প্রবেশ করা মাত্র শিক্ষার্থীকে দণ্ডায়মান হয়ে শিক্ষকের প্রতি সম্মান জ্ঞাপন করতে হয়। এই ধরনের সাপেক্ষীকরণ

শিক্ষণের মূল সূত্র হল সাপেক্ষীকরণ-অনাপেক্ষীকরণ

শিক্ষণের ক্ষেত্রে একান্ত অপরিহার্য। সামাজিক আদব-কায়দা, শিষ্টাচার প্রভৃতি সব কিছুই শিশু সাপেক্ষীকরণের ফলে শিখে থাকে। আবার শিশুর কু-অভ্যাসসমূহ, ভুল প্রতিক্রিয়া ইত্যাদি অনাপেক্ষীকরণ পদ্ধতির সাহায্যে দূর করা যায়। প্যাভ্‌লভ বলেন যে, অনুশীলনের ফলে যে সব অভ্যাস আয়ত্ত হয়েছে তা কতকগুলি ক্রমিক সাপেক্ষ প্রতিবর্ত ক্রিয়ার শৃঙ্খল ছাড়া আর কিছু নয়।

আচরণবাদিগণ (Behaviourists) সাপেক্ষীকরণ তত্ত্বের সাহায্যে সকল প্রকার শিক্ষণের ব্যাখ্যা করেন। বেক্‌টেরেভ্‌ (Bechterev) এবং তার পরে ওয়াট্‌সন (Watson) মানবশিশুর উপর সাপেক্ষীকরণের বিবিধ পরীক্ষণ প্রয়োগ করে যে সব সিদ্ধান্তে এসেছেন, তা প্যাভ্‌লভ কর্তৃক মনুষ্যেতর জীবের উপর পরীক্ষণলব্ধ ফলের অনুরূপ। শিশুর মধ্যে যে সব ভয়কে আমরা প্রকৃতিপ্রদত্ত বলে মনে করি, তার মধ্যে বেশ কয়েকটি জন্মগত নয়। সাপেক্ষীকরণের সাহায্যে শিশু তা অর্জন করেছে। ওয়াট্‌সন এ বিষয় পরীক্ষণের সাহায্যে প্রমাণ করে দেখিয়েছেন। একটি নয় মাসের শিশু (নাম অ্যালবার্ট) ইঁদুর, খরগোশ এবং তুলোর বল দেখে ভয় পেত না। কিন্তু অন্যান্য শিশুদের মতো অ্যালবার্টও স্বাভাবিকভাবেই উচ্চ শব্দ শুনলে ভয় পেত। ওয়াট্‌সন শিশুর কাছে একটি ইঁদুরকে নিয়ে এলেন এবং শিশু যখন নির্ভয়ে ইঁদুরটি স্পর্শ করার জন্য উদ্যত হয়েছে, সেই সময় শিশুর পিছন হতে হঠাৎ একটি উচ্চ শব্দ করা হল। অ্যালবার্টের মুখে-চোখে ভয়ের লক্ষণ পরিস্ফুট হল এবং সে চমকে উঠলো। এই রকম পরীক্ষণ কয়েকবার করার পর দেখা গেল যে, সাপেক্ষীকরণ দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং ইঁদুর দেখলেই অ্যালবার্ট ভয় পেয়ে কেঁদে ফেলে। ওয়াট্‌সন এও দেখিয়েছেন যে, যে সব ভয় স্বাভাবিক নয়, অর্জিত মাত্র, সেইসব ভয়কে নঞর্থক সাপেক্ষীকরণের সাহায্যে দূর করা যায়। স্কুলের ছেলেমেয়েদের কাছে অনেক সময় ইংরেজী এবং গণিত ভীতির বিষয় বলে পরিগণিত হয়। এও সাপেক্ষীকরণের ফল। শিক্ষার্থী প্রথমে যখন বিষয় দুটি শিখতে প্রবৃত্ত হয়, তখন তা শেখার জন্য তার যথেষ্ট আগ্রহই থাকে। কিন্তু ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষাদান পদ্ধতি, একটু ভুল হলেই শাস্তি, ভর্ৎসনা ইত্যাদির দরুন যে স্বাভাবিক ভীতি উৎপন্ন হয়, পরে তা ইংরেজী ও গণিতে সংক্রামিত হয়ে বিষয় দুটিকে ভীতিপ্রদ করে তোলে।

আচরণবাদিগণ সাপেক্ষীকরণ তত্ত্বের সাহায্যে শিক্ষণের ব্যাখ্যা করে

ওয়াট্‌সন 'অনুশীলনের সূত্র'কেই শিক্ষণের ব্যাপারে যথেষ্ট মনে করেন। ফললাভের সূত্রের মধ্যে যেহেতু 'প্রীতিকর' উপাদানের উল্লেখ আছে এবং 'প্রীতিকর' কথাটির সাথে 'মন', 'চেতনা' ইত্যাদি কথা জড়িত থাকতে বাধ্য, সেহেতু ওয়াট্‌সন্‌ ফললাভের সূত্রকে 'অবৈজ্ঞানিক বলেছেন এবং বর্জন করেছেন।

অনুশীলনের সূত্রই যথেষ্ট

সমালোচনা ঃ শিক্ষণ সম্পর্কে সাপেক্ষ প্রতিবর্ত মতবাদের আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে যে, এই মতবাদ 'ফললাভের সূত্রে'র সাহায্য না নিয়েই শিক্ষণ প্রক্রিয়ার ব্যাখ্যা দিয়েছে। সুতরাং, সাপেক্ষীকরণ তত্ত্ব সম্বন্ধে একথা বলা যায় যে, কোন প্রকার উচ্চতর মানসিক

খাঁচা থেকে বের হয়ে খাদ্য গ্রহণ করতে পারছে। কিন্তু ওই ধরনের অপর একদল ইঁদুরকে এইরূপ খাঁচার মধ্যে রেখে বাইরে খাবার দিলে, তারা অত তাড়াতাড়ি বাইরে আসতে পারছে না। এর দ্বারা বোঝা যায় যে, প্রথম দলের ইঁদুরগুলি খাঁচার মধ্যে কিছুকাল থাকার জন্য খাঁচার পথ-ঘাটের কিছুটা অন্তত শিখে ফেলেছে, যদিও এই শেখার পিছনে কোন পুরস্কার ছিল না। কাজেই 'প্রচ্ছন্ন শিক্ষণ' মতবাদ থর্নডাইকের ফললাভের সূত্রের গুরুত্ব খর্ব করে দিয়েছে।

পুরস্কারের সাহায্য ছাড়াও প্রাণী যে শেখে তার প্রমাণ 'প্রচ্ছন্ন শিক্ষণ'

অনুশীলনের সূত্রকেও অনেকে যান্ত্রিকতা দোষে দুষ্ট বলে অভিহিত করেছেন। শুধু পুনরাবৃত্তির যে বিশেষ কোন মূল্য নেই তার প্রমাণ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীর খাতা থেকে কম পাওয়া যায় না। গ্যারেট (H. E. Garrett) তাঁর গ্রন্থে[৭] একটি কৌতূহলোদ্দীপক উদাহরণ দিয়েছেন। একজন শিক্ষার্থী 'I have went' লেখার জন্য শিক্ষক মহাশয় তার ভুল সংশোধন করার অভিপ্রায়ে তাকে ক্লাস শেষ হয়ে যাওয়ার পর খাতায় 'I have gone' কথাটি একশবার লিখতে নির্দেশ দিলেন। শিক্ষার্থী নির্দেশমত 'I have gone' কথাটি একশবার লিখে শিক্ষক মহাশয়কে দেখাতে গেল। কিন্তু শিক্ষক মহাশয় বাড়ি চলে যাওয়ায় সে শিক্ষক মহাশয়ের উদ্দেশ্যে একটি ছোট চিঠি লিখলো, "I have written 'I have gone' one hundred times and since you are not here, I have went home." এই উদাহরণের সাহায্যে প্রমাণিত হচ্ছে যে, না বুঝে কেবল পুনরাবৃত্তির ফলে কোন লাভই হয় না। অনুশীলনের সূত্রটিতে আবেগ, আগ্রহ, প্রেরণা, তাড়না এবং বিশেষ নৈপুণ্য অর্জনের উপর কোন গুরুত্বই আরোপ করা হয়নি।

উদ্দেশ্য, আগ্রহ প্রভৃতি বাদ দিয়ে কেবল অনুশীলনের দ্বারা বিশেষ কিছুই আয়ত্ত হয় না

প্রস্তুতির সূত্রকেও থর্নডাইক যেভাবে ব্যাখ্যা করেছেন তাতে নিউরোন গোষ্ঠীর প্রস্তুতিকেই প্রস্তুতি বলা হয়েছে। কিন্তু প্রস্তুতির সূত্রে যদি মানসিক প্রস্তুতির ইঙ্গিত না থাকে, তাহলে প্রস্তুতির সূত্রকে ঠিক বুঝে ওঠা যায় না।

প্রস্তুতির সূত্রও মন ছাড়া বোধগম্য নয়

এইসব সমালোচনা সত্ত্বেও বলা যায় যে, থর্নডাইকের শিক্ষণের সূত্র সম্পর্কে যে অভিযোগই করা হোক না কেন, শিক্ষাতত্ত্বের উপর এদের প্রভাব তাতে আদৌ কমে যায়নি। বরঞ্চ ভবিষ্যৎকালের শিক্ষা-মনোবিদ্‌গণ শিক্ষা প্রসঙ্গে আলোচনাকালে এইসব সূত্র থেকে প্রভূত সাহায্য পাবেন।

শিক্ষণ সূত্রগুলির গুরুত্ব

অনুশীলনের সূত্রকে শিক্ষণের সূত্র হিসাবে স্বীকার করতে আপত্তি থাকলেও নৈপুণ্য অর্জনের ব্যাপারে অনুশীলনের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। বিদ্যালয়ের পাঠ্যবিষয় শিক্ষার ক্ষেত্রেও অনুশীলনের সূত্র প্রযোজ্য। কোন কবিতা মুখস্থ করতে হলে ঠিকভাবে তা বারে বারে অভ্যাস করতে হবে, নতুবা কবিতা মুখস্থ হবে না।

অনুশীলনের সূত্রের গুরুত্ব

---

৭. H. E. Garrett : Great Experiments in Psychology. P. 57.

ফললাভের সূত্রকে অবহেলা করা যায় না। আমাদের কোন আচরণের ফল যদি দুঃখজনক হয় কিংবা এর ফলে যদি আমরা শাস্তি অথবা সমাজের নিন্দা লাভ করি, তবে আমরা আর সেই আচরণের পুনরাবৃত্তি করি না। অপরপক্ষে, আমাদের যে আচরণ প্রশংসিত হয়, আমরা সেই আচরণের পুনরাবৃত্তি করি এবং পুনরাবৃত্তির ফলে ওই আচরণ দ্রুত ও নির্ভুল হয়। বিদ্যালয়ে পুরস্কার, সুখ্যাতি, উৎসাহদান, শাস্তি, ভর্ৎসনা প্রভৃতির রেওয়াজ ফললাভের সূত্রের উপর নির্ভর করেই গড়ে উঠেছে।

ফললাভের সূত্রও উপেক্ষণীয় নয়

প্রস্তুতির সূত্রকেও মূল্যহীন বলা চলে না। মানসিক প্রস্তুতি অথবা দেহযন্ত্রের প্রস্তুতি, যাই হোক না কেন, শিক্ষার্থীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাকে দিয়ে কিছুই শেখানো যায় না। আবার, মনের দিক থেকে শিক্ষার্থী প্রস্তুত থাকলেও তার স্নায়ু যদি অবসন্ন হয়, তবে শিক্ষার্থী শিক্ষণীয় বিষয় গ্রহণ করতে পারে না।

প্রস্তুতির সূত্র মূল্যহীন নয়

॥ ৪ ॥ শিক্ষণ সম্পর্কে সাপেক্ষ প্রতিবর্তক্রিয়াবাদ (Conditioned Response theory of Learning) :

প্রতিবর্ত ক্রিয়া (Reflex action) : কোন উদ্দীপক কর্তৃক সংবেদনবাহী স্নায়ুর উদ্দীপনার ফলে যে স্বতঃস্ফূর্ত, তাৎক্ষণিক ও একরূপ প্রতিক্রিয়া হয় তাকে প্রতিবর্ত ক্রিয়া বলে। যেমন—চোখের উপর আলোর ঝলক পড়া মাত্রই আমরা চোখ বন্ধ করি। গলার ভিতরে কোন প্রদাহ হলেই আমরা কাশি। নাকের মধ্যে কিছুর সুড়সুড়ি লাগলেই আমরা হাঁচি। এ সবই প্রতিবর্ত ক্রিয়ার উদাহরণ। এসব ক্ষেত্রে উদ্দীপকের প্রয়োগ হওয়া মাত্রই প্রতিক্রিয়া ঘটে। এসব ক্রিয়ার মধ্যে কোন পূর্বচিন্তার স্থান নেই এবং আমরা ইচ্ছা করলেও এসব ক্রিয়াকে রোধ করতে পারি না।

যে ধরনের প্রতিবর্তক্রিয়ার কথা বলা হল, সে ধরনের ক্রিয়াকে বলা হয় 'সরল প্রতিবর্ত ক্রিয়া' (simple reflex action)। সরল প্রতিবর্ত ক্রিয়ায় একটি উদ্দীপকের প্রয়োগের ফলে একটি প্রতিক্রিয়া ঘটে। এই উদ্দীপক বাহ্য জগতের কোন বস্তু হতে পারে অথবা দেহের ভিতরের কোন পরিবর্তনও হতে পারে। গরম জিনিসে হাত লাগা মাত্রই আমরা অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করেই হাত সরিয়ে নিই। এই সরল প্রতিবর্ত ক্রিয়ায় উদ্দীপকটি এসেছে বাহ্য জগৎ থেকে। নাকের মধ্যে সুড়সুড়ি লাগলেই আমরা হাঁচি। এখানে উদ্দীপক দেহের ভিতরে অবস্থিত।

আবার, একটি সরল প্রতিবর্ত ক্রিয়া অন্য একটি সরল প্রতিবর্ত ক্রিয়ার সৃষ্টি করে। দ্বিতীয়টি আবার তৃতীয় একটি সরল প্রতিবর্ত ক্রিয়ার সৃষ্টি করে। এভাবে প্রতিবর্ত ক্রিয়াগুলি পর্যায়ক্রমে যুক্ত হয়ে একটি জটিল ক্রিয়ার সৃষ্টি করে। পর্যায়ক্রমে যুক্ত একাধিক প্রতিবর্ত ক্রিয়াকে 'জটিল প্রতিবর্ত ক্রিয়া' কিংবা 'প্রতিবর্ত ক্রিয়া শৃঙ্খল' (chained reflex) বলে। যেমন—নাকে তীব্র গন্ধ যাবার ফলে হাঁচি হয় এবং হাঁচির ফলে চোখে জল দেখা দেয়।

অনুশীলনের সূত্রের অন্তর্গত কয়েকটি উপসূত্র (sub-law) আছে, যথা—'পৌনঃপুনিকতার সূত্র' (Law of frequency), 'সাম্প্রতিকতার সূত্র' (Law of recency), এবং 'তীব্রতার সূত্র' (Law of vividness or intensity)। 'পৌনঃপুনিকতার সূত্রে' পুনরাবৃত্তির ফলের কথা বলা হয়েছে। বারে বারে কোন কাজ করলে তবেই কাজটি শেখা যায়। 'সাম্প্রতিকতার সূত্রে' বলা হয়েছে যে ৎ জিনিস সম্প্রতি অর্থাৎ এইমাত্র শেখা হয়েছে, সেই কাজটি করতে ভুল-ভ্রান্তি খুব কমই হয়। 'তীব্রতার সূত্রের' অর্থ হচ্ছে আগ্রহ নিয়ে সক্রিয়ভাবে যে কার্য করা হয় তা আমরা তাড়াতাড়ি শিখি। শিশুকে তার পাঠ্য-বিষয় বারে বারে পড়তে হবে (পৌনঃপুনিকতা), পড়ার পরই তা আবৃত্তি করতে হবে (সাম্প্রতিকতা) এবং যেসব বিষয়ে তার আগ্রহ আছে, সে সবের সাথে অধীত বিষয়ের সম্বন্ধটি বুঝে নিতে হবে (তীব্রতা), তবেই শিশুর অধীত বিষয়টি শেখা হবে।

অনুশীলনের সূত্রের কয়েকটি উপসূত্র

ফললাভের সূত্র এবং অনুশীলনের সূত্রকে সংযুক্ত করে শিক্ষণের প্রধান সূত্রটি পাওয়া যায়। যেমন, যে প্রতিক্রিয়ার ফলে প্রীতিকর অবস্থার উদ্ভব হয়, তার পুনরাবৃত্তি করা হয় এবং এর ফলে প্রতিক্রিয়াটি স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়।

ফললাভের সূত্র ও অনুশীলনের সূত্রের সংযুক্তি

(৩) প্রস্তুতির সূত্র (Law of Readiness) ঃ যখন কোন শিক্ষার্থী কোন উদ্দীপকে প্রতিক্রিয়া করার জন্য প্রস্তুত থাকে, তখন প্রতিক্রিয়া করলে সুখকর অনুভূতি হয় এবং না করলে বিরক্তি বোধ হয়। আবার শিক্ষার্থী যখন প্রতিক্রিয়া করতে প্রস্তুত থাকে না, তখন প্রতিক্রিয়া করতে হলে বিরক্তিবোধ হয়।[৫] 'প্রস্তুতি' বলতে অবশ্য থর্নডাইক 'স্নায়ুতন্ত্রের প্রস্তুতি' বুঝেছেন। যখন কোন উদ্দীপক স্নায়ুতন্ত্রের (nervous system) উপর কার্য করে, তখন ওই উদ্দীপক-সৃষ্ট শক্তিকে যে সব নিউরোন (neurone) মস্তিষ্কের উপযুক্ত অংশে বহন করে নিয়ে যায়, তাদের বলে 'পরিবহন একক' (conduction unit)। সব 'পরিবহন একক'ই সব সময় স্নায়বিক শক্তি গ্রহণ ও পরিবহণ করার জন্য প্রস্তুত থাকে না। কাজেই, যখন এরকম কোন 'পরিবহণ একক' অর্থাৎ নিউরোন গোষ্ঠী পরিবহণের জন্য প্রস্তুত থাকে, তখন পরিবহণের ব্যাপারটি সুখকর এবং পরিবহণের কার্য না করাটাই ক্লেশজনক।[৬]

সূত্রটির ব্যাখ্যা

(৪) একই উদ্দীপকে বহু প্রতিক্রিয়ার সূত্র ঃ প্রাণী যখন কোন নতুন পরিস্থিতি, উদ্দীপক বা সমস্যার সম্মুখীন হয়, তখন সে ঐ পরিস্থিতির সমাধানে তার যাবতীয় জন্মগত ও অর্জিত প্রতিক্রিয়া প্রয়োগ করে থাকে। এইসব নানা প্রকার প্রতিক্রিয়ার মধ্যে কোন্ প্রতিক্রিয়া বাঞ্ছনীয়, তা নির্ধারিত হয় ফললাভের সূত্রের দ্বারা। অর্থাৎ যে প্রতিক্রিয়ার ফলে সুখকর অভিজ্ঞতা হয়, সেটিই নির্বাচিত হয়।

৫ "When a bond is ready to act, to act gives satisfaction and not to act gives annoyance ; When a bond is not ready to act, is made to act, annoyance is caused."—*Thorndike.*

৬ "For a conduction unit ready to conduct ; to do so is satisfying and not to do so is annoying."—*Thorndike.*

(৫) মানসিক অবস্থার সূত্র ঃ কোন্ উদ্দীপনায় কোন্ প্রতিক্রিয়া করতে হবে, তা প্রাণীর মেজাজ, প্রস্তুতি, প্রয়োজন ইত্যাদির দ্বারা নির্ধারিত হয়। খাঁচার বিড়ালটি যদি ক্ষুধার্ত না হত, তবে সে চেষ্টা করে বাইরে আসতো না ; খাঁচার মধ্যেই ঘুমিয়ে থাকতো। একটি উদ্দীপকের সম্বন্ধে দেহমনের বর্তমান অবস্থা ও প্রস্তুতিই প্রতিক্রিয়ার স্বরূপটি নির্দেশ করে দেয়।

(৬) আংশিক প্রতিক্রিয়ার সূত্র ঃ শিক্ষণ-প্রক্রিয়া যত অগ্রসর হয় ততই প্রাণী অপ্রয়োজনীয় আচরণগুলি বর্জন করে পরিস্থিতির আসল অংশ সম্পর্কে প্রতিক্রিয়া করে। খাঁচার কলাকৌশল শেখার পর বিড়াল খাঁচার দরজার ছিটকিনির প্রতি বেশী নজর দেয়।

(৭) সদৃশীকরণ ও উপমানের সূত্র ঃ শিক্ষণের অর্থই হল সমন্বয় সাধন। প্রাণী কোন নতুন অবস্থার সম্মুখীন হলে অতীতে অনুরূপ অবস্থায় যে রকম আচরণের ফলে পরিস্থিতির সুষ্ঠু মোকাবিলা করেছিল, অনুরূপ আচরণের সাহায্যে বর্তমান পরিস্থিতির সমাধান করতে চেষ্টা করে।

(৮) অনুষঙ্গমূলক সঞ্চালনের সূত্র ঃ একে 'সাপেক্ষ প্রতিবর্ত সূত্র' (conditioned reflex) বলা যেতে পারে। একটি বিশেষ অবস্থার দ্বারা যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্ট হয়, তা সেই বিশেষ অবস্থার সাথে সংযুক্ত অপর একটি অবস্থার দ্বারাও সৃষ্ট হতে পারে। কোন বিড়ালকে যদি একটি নির্দিষ্ট পাত্রে দুধ পান করতে শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহলে পরে কেবল পাত্র দেখেই বিড়াল পূর্বের মতো আচরণ করবে।

শিক্ষণের সূত্রগুলির সমালোচনা ঃ থর্নডাইকের শিক্ষণের সূত্রগুলি বিরুদ্ধ সমালোচনা থেকে রেহাই পায় নি। শিক্ষণের সূত্রগুলিকে অনেকেই যান্ত্রিক সূত্র বলে মনে করেন অর্থাৎ থর্নডাইক তাঁর শিক্ষণসূত্রগুলির যান্ত্রিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

ফললাভের সূত্রকে যান্ত্রিকভাবে ব্যাখ্যা করা যায় না। স্নায়ুসমূহ সুখবোধ করতে পারে, এর সপক্ষে কোন প্রমাণ নেই। মনের অস্তিত্বকে স্বীকার না করলে 'প্রীতিকর' ও 'বিরক্তিকর' কথাগুলির কোন অর্থ হয় না। এ ছাড়াও, অনেকেই ফললাভের সূত্রকে মূল সূত্র বলে স্বীকার করেন না। ফললাভের সূত্রে বলা হয়েছে যে, কোন আচরণের ফলে যদি প্রীতিকর অবস্থার উদ্ভব হয় অর্থাৎ কোন আচরণ যদি পুরস্কৃত হয়, তাহলে জীব সেই আচরণটি শেখে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দেখা যায়, শিক্ষার্থী হাতেকলমে কার্যের মাধ্যমে নতুন আচরণ বা প্রতিক্রিয়া আয়ত্ত করে। পুরস্কার দিলে এই আচরণ পুনরায় করার সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয় মাত্র। মনোবিদ্ টোলম্যান (Tolman) ফললাভের সূত্রকে অনাবশ্যক বলেছেন, কেননা পুরস্কার না দেলেও শিক্ষণ হয়ে থাকে। কেবলমাত্র শেখার জন্য শেখাকে 'প্রচ্ছন্ন শিক্ষণ' (latent learning) বলা হয়। টোলম্যান কতকগুলি ইঁদুরকে একটি গোলকধাঁধার মতো খাঁচার মধ্যে রেখে দিয়ে বাইরে কোন পুরস্কার অর্থাৎ খাদ্য রাখলেন না এবং ইঁদুরগুলিকে খাঁচার মধ্যে বিচরণ করতে দিলেন। পরে যখন তিনি গোলকধাঁধা থেকে বের হবার পথের সম্মুখে খাদ্য রাখলেন, তখন দেখা গেল ইঁদুরগুলি বিশেষ ভুলভ্রান্তি না করে খুব তাড়াতাড়ি

মনের উল্লেখ না করে ফললাভের সূত্র ব্যাখ্যা নয়

(Law of attitude, set or disposition), (৬) আংশিক প্রতিক্রিয়ার সূত্র (Law of partial activity), (৭) সদৃশীকরণ বা উপমানের সূত্র (Law of assimilation or analogy) এবং (৮) অনুষঙ্গমূলক সঞ্চালনের সূত্র (Law of assòciative shifting)।

(১) ফললাভের সূত্র (Law of Effect) : ফললাভের সূত্রকে সহজ করে এভাবে প্রকাশ করা যায়। "কোন উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যে যদি পরিবর্তনসাধ্য সংযোগ স্থাপিত হয় এবং এইরূপ সংযোগের ফল যদি সুখকর বা তৃপ্তিকর হয়, তাহলে সংযোগটির দৃঢ়তা বৃদ্ধি পায়। অপরপক্ষে, যদি উক্ত সংযোগ বিরক্তিকর হয় বা অপ্রীতিকর হয়, তাহলে সংযোগটির দৃঢ়তা কমে যায়।"[৩] খাঁচা থেকে বের হবার জন্য ক্ষুধার্ত বিড়াল নানাভাবে চেষ্টা করে অর্থাৎ প্রতিক্রিয়া করে এবং পরিশেষে খাঁচা থেকে বের হতে সক্ষম হয়। যে আচরণ বা প্রক্রিয়ার ফলে বিড়ালটি খাঁচা হতে বের হতে সক্ষম হয়, সেই সফল আচরণটি ওই পরিস্থিতির সাথে সংযুক্ত হয়ে যায় এবং ভুল আচরণগুলি পরিত্যক্ত হয়। সফল প্রতিক্রিয়া প্রীতিকর এবং অসফল বা ভুল প্রতিক্রিয়াগুলি প্রাণীর নিকট বিরক্তিকর। যে প্রতিক্রিয়ার ফলে প্রীতিকর অভিজ্ঞতা হয়, সেই প্রতিক্রিয়া বা আচরণের পুনরাবৃত্তি করা হয় এবং এর ফলে প্রতিক্রিয়াটি দৃঢ় হয় (stamped in)। যে প্রতিক্রিয়ার ফলে বিরক্তিকর অভিজ্ঞতা হয়, তা পরিত্যক্ত হয় এবং অবলুপ্ত হয়ে যায় (stamped out)। ছিটকিনি খুলে মাছের টুকরো পাওয়া যায় বলে অর্থাৎ তা ফললাভের সহায়ক বলে বিড়াল ছিটকিনি খোলার কৌশল ভুলে যায় না। প্রীতিকর ও বিরক্তিকর পরিস্থিতি কাকে বলা হবে? এর উত্তরে থর্নডাইক বলেন যে, প্রীতিকর পরিস্থিতি হল সেই পরিস্থিতি যাকে পাবার জন্য প্রাণী সবসময় চেষ্টা করে এবং প্রাণী যা সচরাচর পরিহার করে চলে তা বিরক্তিকর পরিস্থিতি বলে গণ্য হবে। এই প্রসঙ্গে থর্নডাইক 'স্বভাবতই প্রীতিকর' (original satisfiers) এবং 'স্বভাবতই বিরক্তিকর' (original annoyers) কথাগুলি ব্যবহার করেছেন। প্রাণীর জৈবিক প্রয়োজনের পক্ষে যা সহায়ক তা প্রাণীর পক্ষে 'স্বভাবতই প্রীতিকর'। ক্ষুধার্ত বিড়ালের নিকট খাদ্য স্বভাবতই প্রীতিকর। প্রাণীর জৈবিক প্রয়োজন পূরণে যা বাধা দেয় তা প্রাণীর নিকট 'স্বভাবতই বিরক্তিকর'। ক্ষুধার্ত বিড়ালের পক্ষে খাঁচার ভিতরে আবদ্ধ থাকা স্বভাবতই বিরক্তিকর, যেহেতু এই পরিস্থিতি খাদ্য-প্রাপ্তিতে বিঘ্ন ঘটাচ্ছে ; সুতরাং, যখন কোন পরিস্থিতি এবং উক্ত পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে কোন আচরণ বা প্রতিক্রিয়ার মধ্যে পরিবর্তন-সাধ্য সংযোগের ফলে সুখকর অবস্থার উদ্ভব হয়,

সূত্রটির ব্যাখ্যা

যে প্রতিক্রিয়ার ফলে প্রীতিকর অভিজ্ঞতা হয় তা দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়

৩. "When a modifiable connection between a situation and response is made and is accompanied or followed by a satisfying state of affairs, that connection's strength is increased, when made and accompanied or followed by an annoying state of affairs, its strength is decreased."—*Throndike : Educational Psychology.*

তখন সংযোগ-সূত্রটি দৃঢ়তর হয়। অপরপক্ষে, এর ফলে বিরক্তিকর অবস্থার উদ্ভব হলে সংযোগ-সূত্রটি শিথিল হয় এবং অবশেষে অবলুপ্ত হয়ে যায়।

থর্নডাইক প্রথমে মনে করতেন যে, উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যে সংযোগ সূত্র দৃঢ়তর করার ব্যাপারে প্রীতিকর অভিজ্ঞতা অর্থাৎ পুরস্কারের প্রভাব এবং সংযোগ-সূত্র শিথিল করায় বিরক্তিকর অভিজ্ঞতা অর্থাৎ শাস্তির প্রভাব সমান সমান। কিন্তু পরবর্তী নানারকম পরীক্ষণের ফলে থর্নডাইক তাঁর এই অভিমত পরিবর্তন করেছেন। সফলতা বা পুরস্কার যেমনভাবে উদ্দীপক ও আচরণের সংযোগ-সূত্রকে দৃঢ়তর করে, ব্যর্থতা বা শাস্তি ঠিক সেই হারে সংযোগ-সূত্রকে শিথিল করে না। আমেরিকান মনোবিদ্ হাল্ (C. L. Hull) এ বিষয়ে কতকগুলি পরীক্ষণ করে থর্নডাইকের অভিমত সমর্থন করেছেন। অতএব, থর্নডাইকের 'ফললাভের সূত্র'কে 'পুরস্কার ও শাস্তির সূত্র' (law of reward and punishment) নামেও অভিহিত করা চলে। পুরস্কার দিলে শিশু খুব তাড়াতাড়ি শেখে। কিন্তু শাস্তি দিয়ে শিশুর ভুল আচরণগুলি ঠিক সেই অনুপাতে সংশোধন করা না যেতেও পারে।

ব্যর্থতামূলক আচরণ সংযোগ সূত্রকে শিথিল করার ব্যাপারে খুব কার্যকর নয়

(২) অনুশীলনের সূত্র (Law of Exercise) : কোন উদ্দীপক ও আচরণের মধ্যে যদি বারংবার সংযোগ ঘটে, তাহলে, অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত থাকলে সংযোগসূত্রটি দৃঢ়তর হয়। আবার উদ্দীপক ও আচরণের মধ্যে সংযোগ যদি বেশ কিছুদিন না ঘটে, তাহলে সংযোগসূত্র শিথিল হয়ে যায়।[৪] এই হল 'অনুশীলনের সূত্র'। এই সূত্রের দুটি অংশ আছে এবং অংশ দুটি পরস্পরের পরিপূরক। অনুশীলনের সূত্রের প্রথম অংশটি 'ব্যবহারের সূত্র' (Law of use), অপর অংশটি 'অব্যবহারের সূত্র' (Law of disuse)। 'ব্যবহারের সূত্রে' বলা হয় যে, একটি উদ্দীপককে যদি একটি প্রতিক্রিয়া বারে বারে করা হয়, তবে ওই উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যে সংযোগসূত্র দৃঢ়তর হয়। বিড়ালটি বহুবার একই পদ্ধতিতে খাঁচার দরজা খুলেছে বলে বিড়াল ওই আচরণ আয়ত্ত করে ফেলেছে। 'অব্যবহারের সূত্রে' বলা হয় যে, কোন উদ্দীপককে যদি কোন প্রতিক্রিয়া দীর্ঘকাল না করা হয়, তাহলে ওই উদ্দীপকের সাথে প্রতিক্রিয়াটির সংযোগ শিথিল হয়ে পড়ে। প্রথমদিকে বিড়ালটি খাঁচার কানাগলির মধ্যে ঢুকে পড়তো। কিন্তু তারপর আর কানাগলির মধ্যে ঢুকতো না বলে অব্যবহারের ফলে কানাগলিতে ঢোকার ঝোঁক কমে গেল।

সূত্রটির ব্যাখ্যা

সূত্রটির দুটি অংশ : ব্যবহারের সূত্র এবং অব্যবহারের সূত্র

৪. "When a modifiable connection is made between a situation and a response for a number of times, that connection's strength is, other things being equal, increased. When a modifiable connection is not made between a situation and a response for a length of time the connection's strength is decreased."—*Thorndike : Educational Psychology.*

বিভিন্ন অংশের মধ্যে কি ধরনের সম্বন্ধ আছে, তা প্রাণী প্রত্যক্ষ করতে পারে। যে সব সমস্যার সমাধান করতে হলে বিভিন্ন অংশের পার্থক্য নির্ণয় এবং তাদের পারস্পরিক সম্বন্ধ বুঝে নেওয়া একান্ত প্রয়োজন, সেইসব সমস্যাও ইঁদুর, বিড়াল এবং কুকুর প্রভৃতি প্রাণী সমাধান করতে পারে।

প্রাণী পরিস্থিতির বিভিন্ন অংশের পার্থক্য ও সম্বন্ধ বুঝতে পারে

প্রাণী এলোপাতাড়ি আচরণের দ্বারা অর্থাৎ অন্ধের মতো প্রচেষ্টার দ্বারা শেখে—একথা গেস্টাল্ট মনোবিদ্ কোহ্লার (Kohler) ও কফ্কা (Koffka) স্বীকার করেন না। তাঁদের মতে প্রাণী পরিজ্ঞানের অর্থাৎ অন্তর্দৃষ্টির (insight) সাহায্যে শেখে। এলোপাতাড়ি আচরণের দ্বারা শিক্ষণে অনেক সময় লাগে। কিন্তু প্রাণী দ্রুতগতিতেও শিখে থাকে। গেস্টাল্ট মনোবিদ তাঁদের অভিমতের সপক্ষে প্রাণীদের 'দ্রুত শিক্ষণের' দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছেন। থর্নডাইক অবশ্য প্রত্যুত্তরে বলেছেন যে, যেখানে প্রাণী সত্যই দ্রুতগতিতে শিখেছে, সেখানে সমস্যাটি নিশ্চয় সহজ ছিল। সমস্যা জটিল হলেই প্রাণীর আচরণ এলোপাতাড়ি হয় এবং সে বোকার মতো ভুল আচরণ করে। কফ্কা কিন্তু বলেন যে, সমস্যার সমাধানে যেখানেই সম্ভব সেখানেই প্রাণী বুদ্ধি অথবা পরিজ্ঞানের পরিচয় দিয়ে থাকে। যেখানে সমস্যাটি জটিল, সেখানেই প্রাণী এলোমেলো আচরণ করে। আমাদের কাছে সমস্যাটি খুবই সহজ বলে আমরা আমাদের দৃষ্টিকোণ থেকে প্রাণীর ওইরূপ আচরণকে 'বোকার মতো আচরণ' বলে অভিহিত করি। এভাবে অভিহিত করা ভুল।

প্রাণীর শিক্ষণে পরিজ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়

প্রাণীরা অনুকরণের সাহায্যে শেখে না—একথাও সকলে স্বীকার করেন না। বানরের অনুকরণ-পটুতা সকলেরই জানা আছে। সুনিয়ন্ত্রিত পরীক্ষণের মাধ্যমে দেখা গিয়েছে যে, বানর-জাতীয় জীব অতি উচ্চ শ্রেণীর অনুকরণাত্মক আচরণ করতে পারে।

অনুকরণের সাহায্যেও শিক্ষালাভ হয়

থর্নডাইকের মতে পরীক্ষণাধীন বিড়াল কেবল কতকগুলি দৈহিক আচরণের পারম্পর্য শিক্ষা করেছে। কিন্তু তাঁর এই অভিমত গ্রহণযোগ্য নয়। বিড়াল খাঁচার ছিটকিনির অবস্থান এবং ছিটকিনি খোলার কৌশল শেখার পর, পরবর্তী প্রচেষ্টার সময় যেখানে ছিটকিনি ছিল সেখানে সোজাসুজি চলে যায়। যদি সেখানে ছিটকিনি না দেখে, তবে আর ওই জায়গায় ছুটে যায় না। এর দ্বারা স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে, বিড়াল খাঁচার রহস্য, দরজা ও ছিটকিনির অবস্থান এবং খাঁচা থেকে বের হতে হলে এগুলিকে কিভাবে ব্যবহার করতে হয়, তার সব কিছুই অনুধাবন করতে পেরেছে।

শিক্ষণ কেবল কতকগুলি দৈহিক আচরণের পারম্পরা নয়

থর্নডাইক 'সংযোগ-সূত্র' প্রতিষ্ঠার উপর খুব গুরুত্ব আরোপ করেছেন। কিন্তু 'সংযোগ-সূত্র' বলতে যদি নিউরোনসমূহের মধ্যে সংযোগ বোঝায়, তাহলে তা খুবই অস্পষ্ট।

এ ছাড়াও থর্নডাইকের প্রচারিত শিক্ষণপদ্ধতি দীর্ঘসূত্রী এবং এতে অযথা সময় ও শক্তির অপচয় হয়।

প্রথমদিকে থর্নডাইক তাঁর শিক্ষণ-সম্পর্কিত মতবাদকে অন্ধ ও যান্ত্রিক প্রক্রিয়া হিসাবেই ব্যাখ্যা করেছিলেন। কিন্তু পরে তিনি তাঁর মতবাদকে এমনভাবে সংশোধন করেন যে, তাঁর মতবাদকে যান্ত্রিক মতবাদ বলে গণ্য করা চলে না। তিনি তাঁর মতবাদের মধ্যে 'অন্তর্ভুক্তি' (belongingness)-এর ধারণা এনেছেন। 'অন্তর্ভুক্তি' বলতে সমগ্র এবং অংশসমূহের সম্বন্ধের জ্ঞান বোঝায়। শিক্ষণীয় বস্তুসমূহের মধ্যে এই ধরনের সম্বন্ধ যে যত তাড়াতাড়ি ধরতে পারে, সে তত সহজে শিক্ষণীয় বস্তু আয়ত্ত করতে পারে। এই কথা স্বীকার করার ফলে থর্নডাইকের মতবাদ যান্ত্রিকতার পর্যায় থেকে অনেক দূরে সরে গিয়েছে। তা ছাড়া থর্নডাইক শিক্ষণের ব্যাপারে আগ্রহ বা প্রেষণার (motivation) গুরুত্ব স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন। বাহ্য উদ্দীপক অপেক্ষা প্রাণীর প্রয়োজন, আকাঙ্খা, আগ্রহ ইত্যাদি তার আচরণের গতি ও প্রকৃতি নির্ধারণ করার ব্যাপারে বেশী গুরুত্বপূর্ণ। অভাববোধের ফলে প্রাণী তার পরিবেশকে এমনভাবে পরিবর্তিত করতে পারে, যাতে তার ভবিষ্যৎ প্রয়োজন সিদ্ধ হয়। পরিশেষে, আভ্যন্তরীণ আগ্রহই নির্ধারণ করে প্রাণী কিরূপ আচরণ করবে এবং কিরূপ আচরণ করবে না। সুতরাং, শেষ পর্যন্ত থর্নডাইক তাঁর মতবাদে অনেক গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সাধন করেছিলেন।

থর্নডাইক নিজেই পরবর্তীকালে তাঁর মতবাদের সংশোধন করেছিলেন

পরিশেষে বলা যায় যে, থর্নডাইকের শিক্ষণ-সংক্রান্ত মতবাদের শিক্ষাজগতে এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান আছে এবং দীর্ঘকাল ধরে ভবিষ্যতের শিক্ষণ-সংক্রান্ত গবেষণার ব্যাপারে এ মতবাদ একটি অবলম্বন হিসাবে পরিগণিত হবে। প্রচেষ্টা ও ভুল সংশোধনের মাধ্যমে শিক্ষণ কতকগুলি বিষয়ে খুবই সাহায্য করে। স্কুল-কলেজে যে সব বিষয় যুক্তি-তর্কের সাহায্যে বুঝে নিতে হয় সেসব বিষয়, বিজ্ঞান, গণিত প্রভৃতি শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রচেষ্টা ও ভুল-সংশোধনের দ্বারা শিক্ষণ খুবই কাজ করে। কাজেই, থর্নডাইকের মতবাদ সর্বাংশে গৃহীত না হলেও তা যে প্রাণীর ও মানুষের শিক্ষার ক্ষেত্রে খানে যথেষ্ট কার্যকরী তা অস্বীকার করা যায় না। মানুষের বর্তমান বৈজ্ঞানিক জ্ঞানভাণ্ডার গড়ে তুলতে প্রচেষ্টা ও ভুল সংশোধনের মাধ্যমে শিক্ষণ কম সাহায্য করেনি।

থর্নডাইকের মতবাদের গুরুত্ব

(খ) থর্নডাইকের শিক্ষণের সূত্র (Thorndike's Laws of Learning) :

প্রাণী কিভাবে শেখে সে সম্বন্ধে নানারকম পরীক্ষণের পর থর্নডাইক শিক্ষণ সম্পর্কে তিনটি প্রধান সূত্র প্রণয়ন করেন। এইসব সূত্র অনুসারে 'প্রচেষ্টা ও ভুল সংশোধনের' মাধ্যমে শিক্ষণ নিষ্পন্ন হয়। এই সূত্রগুলি 'থর্নডাইকের শিক্ষণের সূত্র' (Thorndike's Laws of Learning) নামে পরিচিত। তিনটি প্রধান সূত্রের নাম হল—(১) ফললাভের সূত্র (Law of effect) (২) অনুশীলনের সূত্র (Law of exercise) এবং (৩) প্রস্তুতির সূত্র (Law of readiness)। এই তিনটি প্রধান সূত্রের সাথে পরে তিনি আরও পাঁচটি গৌণ সূত্র যোগ করেছেন। গৌণ সূত্রগুলি হল, (৪) একই উদ্দীপকে বহু প্রতিক্রিয়ার সূত্র (Law of multiple response to the same external stimulus) (৫) মানসিক অবস্থার সূত্র